যে গল্পের শেষ নেই

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'যে গল্পের শেষ নেই' ... ... আমি নিজেই শুধু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়িনি – ছেলেদের এবং সাধারণ মানুষদের পড়াচ্ছি। তারা কি বোঝে কতখানি বোঝে কিভাবে বোঝে যাচাই করার জন্য। কঠিন কথা, একেবারে অজানা কথা সহজ করে বুঝিয়ে বলা বা লেখার চেয়ে কঠিন কাজ জগতে খুব কমই আছে। বৈজ্ঞানিকদের জন্য বিজ্ঞানের বই লেখার সময় জানা থাকে তারা কতটা বোঝেন না বোঝেন, তাদের বুদ্ধি আর চেতনা কি ধরনের, –কিন্তু অজ্ঞদের বেলা পড়তে হয় মুস্কিলে। তাদের মগজে কি আছে আর কি নেই–যা আছে তার স্বরূপ কি–এসব আন্দাজ করা কঠিন। অথচ শুধু এটুকু আন্দাজ করলেই চলে না। প্রতিনিয়ত তাদের মগজটা কি দিয়ে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা না জানলেও চলে না। ... ...

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যে গল্পের শেষ নেই ■ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ISBN 984 821 028 8

দর্শনের ছাত্র। জীবনদর্শনের অন্বিষ্ট উপায় হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অধ্যয়ন তথা লেখনী চালন। এই লেখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ছিল দুঃসাহসী অভিযান, নূতন পথের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা—যা কোথাও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং কোথাও বিশেষভাবে সমালোচিত। কিন্তু তাঁর মানসিকতা ছিল অভিযাত্রীর—সেখান থেকে তিনি অস্খলিত। কি ছিল তাঁর নিরীক্ষা-পরীক্ষার বিষয়? তা ছিল এক প্রকার দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়—যেটা আমি মনে করি দর্শনের ছাত্রের পক্ষেই সহজ ও সম্ভবপর। দর্শন পদ্ধতি একটা সামগ্রিক দিগ্‌দর্শনের মতো। তিনি সেই পন্থায় মানব জীবন ও মানব সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে প্রথমদিকে অনেকগুলি সহজপাঠ্য (বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও) বিজ্ঞানমুখী গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি তার শিক্ষক জীবনের প্রথম দিকে লেখা। অনুমান করতে পারি—আমাদের দেশের সর্বত্র দর্শনশাস্ত্র পঠন পাঠনের যে ব্যবস্থা আছে তার ঐকদেশিকতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিকতার অভাব তাঁর মতো সমাজ-সচেতন রাজনীতি-করা লোকের কাছে অসুবিধাজনক ঠেকেছে। সুতরাং প্রাথমিক কাজ হিসাবে তিনি নিজেকে মনস্তত্ত্বের ছাত্র হিসাবে তৈরি করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠেছে সমাজ-তাত্ত্বিক, সাম্যবাদী এক ইতিহাসনিষ্ঠ মানুষের। সে সময়কার গ্রন্থগুলির বক্তব্য তিনি পরে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করেছেন পরবর্তী রচনাগুলিতে। বিশ্ববিজ্ঞানদৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্য বিশ্লেষণে এবং আধুনিক মতবাদের সাহায্যে পরিবেশনায়। এই তার সত্যকার দেশপ্রেম, মানবহিতৈষন তথা আত্মবিষ্কারের সুপরিণত উপলব্ধি বলে মনে হয়েছে।

গোপাল হালদার

প্রচ্ছদ ■ মাসুক হেলাল

গল্প আবার সত্যি হয় নাকি? হয়, যদি সে গল্প হয় মানুষের, আর গল্পটার ভিত্তি যদি হয় বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী ইতিহাস। লৌকিক-দৈবিক, উচিত-অনুচিত, বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান, সৃষ্টি-ধ্বংস সমস্ত কিছুর পেছনেই আমরা কেবল মানুষকে, মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্বকেই দেখতে পেয়েছি। প্রকৃতির বুকে মানুষের সেই উদ্ভব বিবর্তন আর বিকাশের কথা সঠিকভাবে না বুঝলে, মানুষকে নিয়ে কোনো কথা বলার জোর থাকে না সব সময়। কাজেই, সহজভাবে, যথাসম্ভব পরিপূর্ণভাবে এ-সব বোঝার তাগিদ আমাদের বরাবরই ছিল।

প্রাক মানুষ, মানুষ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব রাজনীতি ইত্যাকার বিষয় নিয়ে বিস্তর মোটা-মোটা কেতাব লেখা হয়েছে, রয়েছে অতি-মূল্যবান রেফারেন্স বই কিংবা এনসাইক্লোপেডিয়া। কিন্তু এগুলো থেকে মানুষের কথা ঠিক যেন মনপ্রাণ দিয়ে বোঝা যায় না; হয়তো মুখস্থ করা যায়, কিন্তু মন ভরেনা যেন সাধারণ সহজ-বুদ্ধির পাঠকদের। পাঠকদের অতৃপ্তিকে মিটানোর জন্যই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটি। ঠিক যেন পাঠকরা যা চাইছিল তাই বলেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বইটিতে। একেবারে গল্প বলার মতো অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রাঞ্জল কথা কাহিনীতে ভরা। একটুও প্রাচীনত্ব, একটুও জড়ার লক্ষণ নেই। শুধুই মানুষের কথা বইটির প্রতিটি পাতায়। হোক না তা বহু বছর আগের লেখা, কথাগুলো তো আজও সত্যি।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন

মূল্য ৭৫.০০ টাকা

যে গল্পের শেষ নেই

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[অখণ্ড পরিমার্জিত সংস্করণ]

ফরমাস পেয়েছিলাম এমন গল্প বলতে হবে যে-গল্পের শেষ নেই। এ-হেন গল্প অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু তার মধ্যে বেশির ভাগই ফাঁকির গল্প। অথচ যার কাছ থেকে ফরমাস তাকে কোনোমতেই ফাঁকি দেওয়া যায় না।

ফাঁকিও থাকবে না, শেষও থাকবে না,– এমনতরো গল্প শুধু একটাই। সেটা হলো মানুষের গল্প। কতো কোটি বছর আগে শুরু হয়েছে এই গল্প তার খাঁটি হিসেব করাই দায়, আর আজো কোটি কোটি খবরের কাগজের পাতায় সরগরম এই গল্প। আরো অনেক কোটি খবরের কাগজ ছাপিয়েও এ-গল্প শেষ করা যাবে না। গল্পটা বেড়েই চলেছে। চলবেও।

তাই শুরু করতে গেলাম মানুষের গল্প। কিন্তু শুরু করতে গিয়ে দেখি বড় মুশকিল ঃ মানুষের গল্প বলতে গেলে মানুষের কথা থেকে শুরু করা যায় না। কেননা, এককালে পৃথিবীতে মানুষের টিকিটি খুঁজে পাবার জো ছিল না। আবার তারও আগে –ঢের আগে –দুনিয়ার কোথাও চিহ্ন ছিল না পৃথিবী বলে কোনো কিছুর।

ভয় পাবার ভান করলাম, বললাম, থাক্ থাক্। তোমাকে আর অতোখানি কষ্ট করতে হবে না। গল্প বলতে আমি রাজি হলাম।

'বেশ', মেয়েটি আমার খাটের ওপর জাঁকিয়ে বসলো আর বললো, 'তাহলে শুরু করো তোমার গল্প।'

আমি বললাম, 'শুরু তো যা-হোক একটা করে দেওয়া যায়। কিন্তু ভাবছি, শেষ করবো কেমন করে?'

মেয়েটি অম্লান বদনে বললো, 'শেষ করা নিয়েই যদি অতো ভাবনা তাহলে শেষ না হয় না-ই করলে!'

আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, 'তার মানে?'

'কেন? তার মানে, এমন গল্প বলে যাও যে-গল্পের শেষ নেই।'

আমি বললাম, 'এ তো ভারি ফ্যাসাদের কথা হলো। কেননা, শেষ নেই এমন গল্প বেশির ভাগই হলো ফাঁকির গল্প। অথচ, তুমি লোকটি এমনই চালাক যে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া তো চলে না।'

'উঁহু', রুণু বললো, 'ফাঁকি দেওয়া চলবে না। এমন গল্প বলতে হবে যার মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই।'

এমনতরো ফরমাস পেলে সবাই খুব বিপদে পড়ে। আমিও খুব বিপদে পড়লাম। বললাম, 'শেষও থাকবে না, ফাঁকিও থাকবে না –এ-রকম গল্প যে একটাই আছে। কিন্তু সেটা শুনতে কি তোমার ভালো লাগবে?'

'কেন? কার গল্প সেটা? লক্ষী-পেঁচার না হুতোম-পেঁচার?'

'সেই তো বিপদ। লক্ষী-পেঁচারও নয়, হুতোম-পেঁচারও নয়। সেটা হলো তোমার গল্প, আমার গল্প, আমাদের সবাইকার গল্প। তার মানে, মানুষের গল্প। আবার তার মানে গল্পই নয়, সত্যি কথা; পণ্ডিতি ভাষায় যাকে বলে ইতিহাস।'

'উঁহু। ও সব পণ্ডিতি ভাষা বলা চলবে না।'

'তা না হয় নাই বলবো।'

'তাছাড়া, এ-গল্প তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'আমি জেনেছি, বই-টই পড়ে।'

'বইতে কি সব সত্যি কথা লেখা থাকে?'

'সব বইতে নয়', আমি বললাম, 'অনেক বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে, আবার অনেক বইতে মিথ্যে কথা লেখা থাকে। যে-সব বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে সেগুলোর পণ্ডিতি নাম হলো বৈজ্ঞানিক বই।'

'আবার পণ্ডিতি!'

'না না, আর বলবো না।'

'তুমি কি সেই সব বই থেকেই গল্পটা বলবে?'

'তাইতো ভাবছি।'

'বেশ। শুরু করো তোমার গল্প। কিন্তু মনে থাকে যেন –শেষও করতে পারবে না, ফাঁকি দিতেও পারবে না।'

'শুরু করছি! কিন্তু তার আগে একটা কড়ার করতে হবে। কথায় কথায় তুমি আমাকে এ-রকম জেরা করতে পারবে না। কেননা, তাহলে কথায় কথায় আমার গল্প থুবড়ে পড়বে, এগুতে পারবে না।'

'রাজি আছি', রুণু বললো।

আর আমি শুরু করলাম আমার গল্প।

শূন্য নিয়ে ছেলেখেলা?

মানুষের গল্প বলতে বসার একটা মুশকিল আছে। মুশকিলটা হলো, মানুষের গল্প বলতে গেলে মানুষের কথা দিয়ে শুরু করা যায় না। কেননা, এককালে পৃথিবীর কোথাও মানুষের টিকিটি খুঁজে পাবার জো ছিল না। আবার তারও আগে কোথাও পৃথিবী বলে কোনো কিছুর চিহ্ন ছিল না।

তাহলে? কোথা থেকে এলো এই পৃথিবী? মানুষের দলই বা এলো কোথা থেকে?

এই সব কথা থেকেই শুরু করতে হবে মানুষের গল্প। কিন্তু তাতেও খুব মুশকিল আছে। কেননা, এই সব কথা এতো ভয়ানক বেশিদিন আগেকার কথা যে তা শুনে ব্যাপারটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারা যায় না। যেমন ধরো, হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে নিদেনপক্ষে সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে তো বটেই, তার চেয়েও বেশি বছর হতে পারে!

ভেবে দেখো ব্যাপারটা! সাড়ে চারশো কোটি বছর! তার মানে, সাড়ে চারশোর পেছনে সাত সাতটা শূন্য! কিন্তু শূন্য নিয়ে তো সত্যিই ছেলেখেলা নয়। এক একটা শূন্যর চোটেই একেবারে আকাশ পাতাল তফাত হয়ে যায়। একের পিঠে একটা শূন্য বসাও, হয়ে যাবে দশ। অথচ, দশ বছর আগেকার কোনো ব্যাপারই তুমি নিজের চোখে দেখো নি, আর না হয়তো এতো ছোট্ট ছিলে যে তখনকার কোনো কথা তোমার মনে নেই।

আর একটা শূন্য বাড়াও। হয়ে যাবে একশো। একশো বছর, বাস্‌রে! তুমি তো তুমি, তখন তোমার দাদুই বলে জন্মান নি। হয়তো তোমার দাদুর বাবা সবে পাত্‌তাড়ি বগলে করে পাঠশালায় যেতে শিখছে। তখন এই কলকাতা বলে শহরটার চেহারাই কি এই রকম ছিল নাকি? তখনো ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়িরই চল হয় নি, আজকালকার ট্রামগাড়ি আর মোটরগাড়ির কথা তো কেউ ভাবতেই পারতো না। এই রকমঃ একটা শূন্যের চোটে একেবারে অন্য রকম। তারপর আর একটা শূন্য বাড়াও। একের পিঠে তিনটে শূন্য। একহাজার। এক হাজার বছর আগেকার কথা কিছু ভাবতে পারো? তখন, ইংরেজ তো দূরের কথা, আমাদের দেশে মোগল আসেনি, পাঠান আসেনি। কলকাতা শহর তো দূরের কথা এমন কি দিল্লির দরবারের চিহ্নটুকুও নেই! আরো একটা শূন্য বাড়াও, হয়ে যাবে দশ হাজার বছর। বাস্‌রে, সে কি কম কথা? রামায়ণ-মহাভারতেরও আগেকার কথা। তখন শুধু বনজঙ্গল। সভ্য মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। এখানে ওখানে অসভ্য মানুষের দল ফলমূল আর শিকার জোগাড় করবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর যদি আরো একটা শূন্য বাড়াও তাহলে হয়ে যাবে একের পিঠে পাঁচটা শূন্য। তার মানে এক লক্ষ বছর। তখন যে কী রকম ব্যাপার তা আন্দাজ করতেই পারা যায় না।

তাই বলছিলাম, শূন্য নিয়ে ছেলেখেলা নয়। এক একটা করে শূন্য বাড়িয়ে যাওয়া মানেই একেবারে দারুণ রকমের পেছিয়ে পেছিয়ে যাওয়া। পাঁচটা শূন্য-য় যখন পৌছলাম তখন এতোদূর পেছনের কথা ভাববার দরকার পড়লো যে মাথা প্রায় গোলমাল হয়ে যাবার জোগাড়। তাই সাড়ে চারশোর পেছনে সাত সাতটা শূন্য-র কথা ফস্ করে বলে দেওয়াটা যতো সহজ আসলে ব্যাপারটা মোটেই তেমন সহজ নয়।

তার মানে, ভয়ানক আর ভয়ানক রকমের থুরথুরে বুড়ি এই পৃথিবী। এতো থুরথুরে আর এমন বুড়ি যে ভালো করে ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু এর দিকে চেয়ে দেখো, অবাক হয়ে যাবে। বুড়ি কোথায়? সবুজ ঘাস, সোনালী ধান, রঙিন ফুলে ঝলমল। বুড়ি কোথায়? এ তো বরং নিত্যনতুনের মেলা! যে-পাখি আগে কখনো ডাকে নি আজকের ভোরে সেই পাখির ডাক, আগে যেখানে ছিল গভীর অরণ্য আজকের দিনে সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট শহর। চিমনির চুড়োগুলো কী দারুণ উঁচু, বাস্‌রে! মনে হয় আকাশটাকে বুঝি ফুটো করে দেবে। পাঁচশো বছর আগে এ-রকম উঁচু উঁচু চিমনির কথা কেউ ভাবতে পারতো?

চারদিকেই এই রকম। নিত্যনতুন। তাহলে বুড়ি কোথায়?

অথচ বুড়িই। কেননা, সাড়ে চারশো কোটি বছর বয়েসটা তো চারটিখানি কথা নয়। আর হিসেব করে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বয়েস নিদেন পক্ষে অতোগুলো বছর তো হবেই!

বুড়ি পৃথিবীর বয়েস কতো?

কিন্তু কথা হলো, পৃথিবীর বয়েস যে এতোখানি হয়েছে তা জানা গেল কেমন করে? নিশ্চয়ই হিসেব করে। কিন্তু সে-হিসেবটা কেমনতরো? ওঃ,-সে যে ভারি মজার মজার হিসেব। একটা নমুনা দিচ্ছি। শোনো।

ধরো, তুমি আর আমি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছি। পথে এক বুড়ির সঙ্গে দেখা। তার মাথায় অনেক সাদা চুল। আর বুড়ি হয়তো আমাদের বললো, তার চুল পাকবার গল্পটা ভারি মজার। তার নাকি জন্ম হবার পর থেকেই প্রতি বছর হাজারে একটা করে চুল পেকেছে। তারপর, বুড়ি একগাল হেসে, আমাদের জিজ্ঞেস করলোঃ বলো দিখিনি আমার বয়েস কতো হয়েছে?

আমরা আর কী করি? দুজনে মিলে গুনতে শুরু করলামঃ বুড়ির মাথায় সবশুদ্ধ কতোগুলো চুল আছে আর তার মধ্যে কতোগুলোয় পাক ধরেছে, কতোগুলোয় পাক ধরে নি। আমরা হয়তো গুনতি করে দেখলাম, বুড়ির মাথায় সবশুদ্ধ এক লক্ষ চুল আর তার মধ্যে দশ হাজারটা হলো সাদা চুল। এর পর বুড়ির বয়েসটা হিসেব করে ফেলা কিছু কঠিন হবে না। এক বছরে এক হাজারটার মধ্যে একটা করে চুল সাদা হয়েছে; তার মানে এক লক্ষর মধ্যে একশো করে সাদা হয়েছে। সবশুদ্ধ দশহাজার সাদা চুল। তার মানে দশ হাজারকে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করে দেবো, বেরিয়ে যাবে বুড়ির বয়েস। ভাগ করলে কতো হবে? একশো বছর নিশ্চয়ই।

এই রকমই একটা হিসেব করে একদল লোক বুড়ি পৃথিবীর আসল বয়স বের করে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর অবশ্য মাথা নেই, মাথায় একমাথা সাদা চুলও নেই। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আছে এক রকমের জিনিস, যার নাম ইউরেনিয়াম। এই ইউরেনিয়াম বলে জিনিসটা ভারি মজার। এর থেকে একটানা যেন এক রকম তেজ বেরিয়ে যাচ্ছে আর ওই তেজ বেরিয়ে যাবার দরুন ইউরেনিয়াম ক্রমাগতই বদলে যাচ্ছে, বদলাতে বদলাতে একরকম সীসে হয়ে যাচ্ছে। ধরো, মাটি খুঁড়ে একতাল ইউরেনিয়াম পাওয়া গেল, তার

ওজন এক কিলোগ্রাম। হিসেব করে দেখা যায়, এই এক কেজি ইউরেনিয়ামের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ১ + ৭৪০০০০০০০০ কেজি করে ইউরেনিয়াম বদলে গিয়ে সীসে হয়ে যায়। এখন ব্যাপারটা হয় কি জানো? মাটি খুঁড়ে খানিকটা ইউরেনিয়াম তুললে দেখতে পাওয়া যায় ইতিমধ্যেই তার অনেকখানি সীসে হয়ে গিয়েছে। তাহলে ইউরেনিয়ামের ওই তালটার মোট ওজনের তুলনায় তার মধ্যেকার সীসের ওজন কতোখানি এ থেকে নিশ্চয়ই হিসেব করে বলে দেওয়া যায়, ইউরেনিয়ামের ওই তালটার বয়েস কতো হলো। যেমন, যদি দেখি এক কেজির মধ্যে প্রায় ১ + ৭৪০০০০০০০০ কেজি সীসে তাহলে বলবো ইউরেনিয়ামটার বয়েস হলো এক বছর। যদি দেখি প্রায় ১ + ৭৪০০০০০০০০ কেজি তাহলে বলতে হবে ওটার বয়েস একশো বছর। পণ্ডিতেরা বলছেন, পৃথিবী যখন সবে জন্মালো তখন তার বুকে যে-ইউরেনিয়াম ছিল সেটা খাঁটি ইউরেনিয়াম, তার মধ্যে কোনো সীসের ভেজাল ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে যেখান থেকেই ইউরেনিয়াম জোগাড় করা যাক না কেন, দেখা যায় তার মধ্যে খানিকটা করে সীসের ভেজাল। আর তাই, মোট ইউরেনিয়ামটার তুলনায় সীসের যে-ভেজাল তা কতোখানি, এই দেখে হিসেব করে বলে দেওয়া যায় পৃথিবীর বয়েসটা কতো হলো! আমাদের ওই বুড়ির মাথার পাকা চুল গুনে তার বয়েসটা বের করবার মতোই হিসেব নয় কি? এই রকমের হিসেব করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বুড়ি পৃথিবীর বয়েসটা নেহাত কম নয়, নিদেন পক্ষে সাড়ে চারশো কোটি বছর তো হবেই।

সে এক তুমুল কান্ড

ঠিক কোন্‌দিনটা পৃথিবীর জন্মদিন তা ঠিক বলা যাবে না। আজকের আকাশের গ্রহ তারাদের অবস্থা দেখে পৃথিবী কি করে জন্মেছিল তা খানিকটা আঁচ করা যায় শুধু। পৃথিবীর জন্মের আগে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাটা কেমন ছিল? তুমি-আমি যাকে আকাশ বলি, তাকেই পণ্ডিতি ভাষায় বলে মহাশূন্য। পৃথিবীর জন্মের অনেক আগে থেকেই এই মহাশূন্য জুড়ে ছিল ধুলোবালির জঞ্জাল আর হালকা কিছু গ্যাস, যে-রকম গ্যাস ভরে মেলার দিনে তোমরা বেলুন ওড়াও। তবে এ-কথাটা মনে রাখতে হবে যে এই মহাশূন্যের বেশিরভাগটাই ছিল বিলকুল ফাঁকা। ধুলোবালি আর গ্যাস যা ছিল, তাও ছিল এতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে তাদের টের পাওয়ার জো ছিল না। এবার হলো কি, ওই ধুলোবালির কণাগুলো আলাদা আলাদাভাবে একেক জায়গায় জমা হতে লাগলো, আর তাদের মাঝামাঝি জায়গাগুলোতে ঘন হয়ে জমতে থাকলো ওই পড়ে থাকা গ্যাসগুলো। এই জমতে থাকা ধুলোবালির অবস্থা হলো ঠিক মেঘের মধ্যে বৃষ্টির কণার মতো। বৃষ্টির কণাগুলো যেমন আস্তে আস্তে বড় হতে হতে ভারি হয়ে বাতাস থেকে আলাদা হয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, ঠিক তেমনি ওই জমাট ধুলোবালির পিণ্ডগুলো আকারে বাড়তে বাড়তে ভারি হয়ে জমাট-বাঁধা গ্যাস থেকে আলাদা হয়ে সরে গেল। এরপর, ওই পিণ্ডগুলো সবাই মিলে ঠেলা দিয়ে জমাট-বাঁধা গ্যাসের গোলাটাকে নিয়ে গেল তাদের মাঝখানে, আর তাকে মাঝখানে রেখেই তার চারপাশে সবাই মিলে ঘুরতে শুরু করলো। এদিকে ঠেলা আর ঘষাঘষির চোটে গ্যাসের গোলা তো আস্তে আস্তে হয়ে উঠল বেজায় গরম, আর তার ফলেই আবার ফুলতে শুরু করলো আর ঠেলে সরিয়ে দিল ওই ধুলোবালির পিণ্ডগুলোকে আরো দূরে। ওই যে গ্যাসের গোলা, সেটা গরম

হতে হতে হয়ে উঠলো গন্‌গনে এক আগুনের গোলা। ওই আগুনের গোলাটা হলো আসলে আমরা রাতের আকাশে যে অসংখ্য তারা মিটমিট করতে দেখি তারই একটা কিন্তু এরা আমাদের চেয়ে এতো কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে যে দেখতে একেবারে ছোট্ট ছোট্ট লাগে, মনে হয় মিটমিটে জোনাকি যেন। এ-রকমই একটা তারা হলো আমাদের সূর্য। আর ওই যে ধুলোবালির জমাট পিণ্ডগুলোর কথা বলছিলাম, যারা ওই আগুনের গোলাটাকে ঘিরে ঘুরছে, তারাই হয়ে গেল আজকের দিনের গ্রহ। তারই মধ্যে একটা হলো আমাদের পৃথিবী।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, পৃথিবীর জন্ম একা একা হঠাৎ একদিনে হয় নি, তাই তার জন্মদিনটাও নিখুঁত হিসেব করে বলা যাবে না। সূর্য, পৃথিবী আর তার অন্যান্য গ্রহ ভাইয়েরা, এমনকি চাঁদও জন্মেছিল প্রায় একই সময়ে। কে যে কার আগে পরে জন্মেছে সেটা এখনও বোঝবার উপায়ই নেই। তবে এটুকু বলা যায়, এই একসঙ্গে সবাই মিলে জন্মের ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে কমবেশি ৪৬০ কোটি বছর আগে।

এই যে গ্রহগুলো সেগুলো কিন্তু তারার চেয়ে অনেক অনেক ছোটো আর হালকা আর মোটেও তারার মতো অতো গরম নয়। এই গরম ঠান্ডার ফারাকের জন্যই তারারা তারা, আর গ্রহরা গ্রহ-ই থেকে যায়। কতো ছোটো আমাদের এই পৃথিবী সূর্যের তুলনায়? শুনলে অবাক হবে, সূর্য এতো বিরাট যে তার মধ্যে অন্তত তেরো লক্ষ পৃথিবী-র হেসেখেলে ধরে যাবার কথা।

৪৬০ কোটি বছরেরও আগে থেকে সেই যে শুরুতে গ্যাসের গোলাটাকে ঘিরে ধুলোবালির পিণ্ডরা-মানে, আজকের গ্রহরা-ঘুরতে শুরু করেছিল, সেটা কিন্তু আজও একইভাবে চলেছে। আবার সূর্যের মেজাজটা যত গরমই হোক না কেন, পৃথিবীর দিকে তার দারুণ টান। আবার তার দিকেও পৃথিবীর টান কম নয়। কেবল কাছে যাবার উপায় নেই, কাছে গেলেই যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার ভয়। তাই প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে টান আর পালটা টানে পড়ে পৃথিবী অষ্টপ্রহর লাট্টুর মতো ঘুরছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারপাশে।

আকাশে তো অমন কতোশত কোটি কোটি সূর্য। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে কতই না গ্রহ। তবু এই ছোট্ট একটা টুকরোর মধ্যে —আমাদের এই পৃথিবীতে —এমন এক অবাক কাণ্ড ঘটেছে যা সারা আকাশের আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায় নি। এই পৃথিবীর বুকে জন্মেছে এক আশ্চর্য জীব, তারই নাম মানুষ। মাথায় তার বুদ্ধি, হাতে তার হাতিয়ার। আর, মাথার বুদ্ধি খাটিয়ে, হাতের হাতিয়ার মজবুত করে ধরে মানুষ পণ করেছে পৃথিবীকে জয় করবার। দিনের পর দিন আর যুগের পর যুগ ধরে মানুষ জয় করে চলেছে পৃথিবীকে। এই দিগ্বিজয়ের কোনো শেষ নেই। শেষ নেই তাই মানুষের গল্পের।

প্রাণের জন্ম

পৃথিবী যখন সবে জন্মালো তখন তার অবস্থাটা ছিল ঠাণ্ডা ধুলোবালির জঞ্জাল দিয়ে তৈরী বিরাট একটা বলের মতো। না ছিল বাতাস, না ছিল সমুদ্র। বলের ওপর দিকটা চাপ দিচ্ছিল ভেতর দিকে আর তার ফলে ভেতর দিকটা আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিল গরম। আর

ওই যে ইউরেনিয়ামের মতো একদল জিনিসের কথা বলছিলাম যাদের ভেতর থেকে একটানা তেজ বেরোতে থাকে, তারাও তাদের তেজ দিয়ে ভেতরটাকে গরম করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সব মিলিয়ে পৃথিবীর পেটের ভেতরটা এত গরম হয়ে উঠলো যে সেই ভীষণ গরমে ভেতর থেকে ঠেলা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লো ভেতরে আটকে পড়া গরম বাতাস আর গরম বাষ্প। তারপর যতো দিন যেতে লাগলো বলের বাইরের দিকটার ঠাণ্ডায় সেই গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে জমে জল হলো, আর তৈরি করলো বিশাল সমুদ্র। পৃথিবীর জন্ম হবার প্রায় ১০০ কোটি বছর পর এই জলের মধ্যেই জন্ম নিলো এক আশ্চর্য জিনিস - 'প্রাণ'।

পৃথিবীতে প্রাণ এলো কিভাবে? পৃথিবী থেকেই নিশ্চয়। পৃথিবীর জন্ম হবার পর, যে-সব মালমশলা তার ভেতরে ছিল, সেগুলোই মিশ খেতে খেতে এক সময়ে প্রাণের জন্ম হলো। কেমন করে জন্ম হলো সেই প্রাণের, সেটা জানতে হলে আগে জানা দরকার কী কী মালমশলা মজুত ছিল এই পৃথিবীতে।

পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই হরেক রকমের জিনিস। লক্ষ লক্ষ রকমের জিনিস। আসলে কিন্তু মাত্র ৯২ রকমের জিনিস নানানভাবে মিশেল খেতে খেতে এতো সব লক্ষ ধরনের জিনিস তৈরি করেছে। এই ৯২ ধরনের জিনিসকে বলা হয় মৌলিক জিনিস ঃ কোনোটার নাম নাইট্রোজেন, কোনোটার নাম অক্সিজেন, কোনোটার নাম হাইড্রোজেন, কোনোটার নাম কার্বন। মৌলিক জিনিসগুলো এমনই যে এগুলোর মধ্যে অন্য কোনো কিছুর মিশেল নেই। যতোই ভাঙো না কেন, একটা মৌলিক জিনিস থেকে অন্য জিনিস পাবার উপায় নেই। এরকম ভাঙতে ভাঙতে এতো ছোট্ট একটা টুকরো পাওয়া যাবে, যার পর ভাঙলে সেই মৌলিক জিনিসটা জিনিস হিসেবে বরবাদ হয়ে যাবে। এই ছোট্ট টুকরোগুলোর পণ্ডিতি নাম হলো পরমাণু। আর পরমাণুর জোট থেকে তৈরি হয় আর একটু বড় টুকরো— যার নাম অণু।

মাত্র ৯২টা মৌলিক জিনিস। যেমন ধরো, বাংলা ভাষায় কতোই তো কথা আছে। অভিধান খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় কতো হাজার কথা। কিন্তু এতো হাজার কথা তৈরি হয়েছে মাত্র গোটা কতক অক্ষর দিয়ে ঃ অ, আ, ক, খ, এই ধরনের অক্ষর। পৃথিবীর বেলাতেও অনেকটা এই রকম। এখানকার এতো যে সব হাজারো রকমের জিনিসপত্র তার সব কিছুই তৈরি হয়েছে ওই ৯২টা মৌলিক পদার্থের রকমারি মিশেল দিয়ে। তার মানে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, আর এই ধরনের বাকি ৮৮টা মৌলিক জিনিসকে পৃথিবীর বর্ণমালা বলা চলে। যেমন ধরো জল। জল তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নামের দুরকম জিনিস মিলে। জলের মধ্যে দিয়ে ঠিকমতো বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে দিতে পারলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এর এই মিশেলটা ভেঙে যাবে, জলের বদলে পাওয়া যাবে দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। কিংবা ধরো পাতে খাবার

নুন। এই নুন তৈরি হয়েছে সোডিয়াম আর ক্লোরিন নামের অন্য দুরকম মৌলিক জিনিস দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ, এই সব মৌলিক জিনিসের আসল নামগুলো বড়ো খটোমটো। তাই ঠিক করা হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট সোজাসোজা ডাক-নাম দিয়ে এগুলোকে চেনবার। যেমন ধরো, হাইড্রোজেনের নাম শুধু H, নাইট্রোজেনের নাম শুধু N, অক্সিজেনের নাম শুধু O, সোডিয়ামের নাম Na, ক্লোরিনের নাম শুধু Cl। তাই, জলকে বলে H_2O ঃ দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। পাতে খাবার নুন-কে বলে NaCl ঃ একভাগ সোডিয়াম আর একভাগ ক্লোরিন।
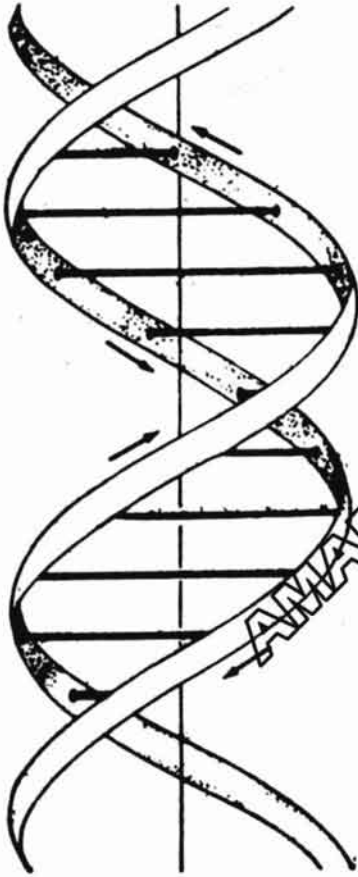
ডি এন এ (DNA)-র চেহারা। এটা যেন একটা মই-মই-এর সিঁড়িগুলো এক এক জোড়া নিউক্লিওটাইড। মইটা কিন্তু সোজা নয়-নারকেল দড়ির মতো পাকানো।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, অণুকে ভাঙলে পাওয়া যাবে পরমাণু। যে-সব জিনিসের অণুকে ভাঙলে শুধু একই রকমের মৌলিক জিনিসের বদলে দুরকম বা তারও বেশি রকমের পরমাণু পাওয়া যায়, তাদের বলি যৌগিক জিনিস। যেমন কিনা জল। এই যে জল বা পাতে খাবার নুনের মতো যৌগিক জিনিসের কথা বললাম সেগুলোর নাম অজৈব যৌগিক। তার মানে কি? মানে হলো, জীবদেহের বাইরেই যাদের অনেক বেশি করে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাহলে জীবদেহ তৈরি হয়েছে কি দিয়ে? নিশ্চয়ই জৈব যৌগিক জিনিস দিয়ে। সেটা কি এমন জিনিস যার জন্য জল বা খাবার নুনের থেকে জীবদেহকে আলাদাভাবে চিনতে পারি। ঐ যে বলছিলাম যৌগিক অণুর কথা, জীবদেহ তৈরি হয়েছে যে-সব যৌগিক অণু দিয়ে তারা ঐ খাবার নুনের মতো অণুর চেয়ে অনেক বড় আর ভারি। এদের একটা মজা হলো, কার্বনকে তুমি এদের মাঝে খুঁজে পাবেই পাবে। এছাড়াও যাদের নিয়ে ওই অত বড় অণুগুলো তৈরি হয় তারা হলো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর ফসফরাস।

যেমন ধরো চিনি, এটা এই রকমের অণু হলেও অন্যদের তুলনায় খুবই ছোটো। তবুও তারও চেহারাটা আকারে মোটেও ছোটোখাটো নয়। ওই খাবার নুনের চেয়ে অনেক বড়। চিনিকে বলে $C_{12}H_{22}O_{11}$ তার মানে সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশটা পরমাণু জোট বেঁধেছে, তুলনায় খাবার নুনে আছে মাত্র দুটো, আর জলে আছে তিনটে।

জীবদেহে আছে এমন দু-ধরনের প্রকাণ্ড অণু, যার জন্য একখণ্ড পাথরের টুকরো থেকে একটা ইঁদুরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এই অণুরা আকারে যেমন প্রকাণ্ড নামেও তেমনি বিশ্রীরকম খটোমটো। এক ধরনের অণুর নাম ডি-অক্সি-রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ছোটো করে ডি এন এ (D N A), আর একধরনের নাম রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ (R N A)। এখানে মনে রাখা দরকার এই বিশাল অণুরাও কিন্তু তৈরি হয়েছে আসলে, একই রকমের মৌলিক জিনিস দিয়ে, কার্বন তো বটেই, তার সঙ্গে সেই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন আর ফসফরাসেরা। তবে কিনা, একটা ছোট্ট ইঁদূরের শরীরের DNA আর তোমার শরীরের একটা DNA-র মাপে অনেক তফাত। কত বড় শুনবে, তোমার আমার শরীরের একটা DNA ? ১,০০০ কোটি পরমাণু মিলে তৈরি করেছে তোমার-আমার শরীরের একেকটা DNA অণুকে।

বুঝতেই পারছো, এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড DNA আর RNA অণুরা হঠাৎ একদিনে আপনা থেকে নিশ্চয়ই তৈরি হয় নি। অনেক অনেক দিন ধরে ধাপে ধাপে অনেক রকমের ছোটো ছোটো অণুরা জোট পাকাতে পাকাতে সেই ৩৫০ কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছিল ওই বিশাল অণুগুলো; পৃথিবীর বয়স তখন খুব বেশি হলে ১০০ কোটি বছর।

কিসে কিসে মিশ খেয়ে আর কী কী ধাপ পেরিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটলো? সেসব জিনিসের নামও বেশ খটোমটো। যেমন, DNA তৈরি হলো তার চেয়ে অনেক ছোটো অণু নিউক্লিওটাইডদের জুড়ে জুড়ে। এই নিউক্লিওটাইডরা আবার তৈরি হয়েছে তাদের চেয়ে অনেক ছোটো ছোটো তিন ধরনের অণুদের জুড়ে জুড়ে ঃ চিনির মতো যারা তাদের বলে শর্করা। আর তা ছাড়াও আছে ক্ষার আর ফসফেট নামের অণুরা। DNA-র সঙ্গে প্রাণসৃষ্টির কাজে যারা জোটে তারা হলো নানা রকমের প্রোটিন বলে জিনিসের অণু। এই প্রোটিন অণুরা আবার তৈরি হয়েছে তাদের চেয়ে অনেক ছোটো ছোটো অ্যামিনো অ্যাসিড অণুদের জুড়ে জুড়ে, আর এই জুড়ে দেবার কাজটা করে আমাদের একটু আগেই চেনা RNA নামের অণুরা।

তাহলে বুঝতেই পারছো, এই অ্যামিনো অ্যাসিডেরা চেহারার দিক দিয়ে DNA আর প্রোটিনদের চেয়ে কতো ছোটো, আবার সংখ্যায়ও তারা খুবই কম। মাত্র কুড়ি রকমের। সারা দুনিয়ায় জীবন্ত যা কিছু দেখতে পাও তারা কিন্তু আসলে তৈরি হয়েছে মাত্র এই কুড়ি রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশেলে।

কোথা থেকে কীভাবে এলো এই অ্যামিনো অ্যাসিড ? আর কীভাবেই বা তৈরি হলো ওই DNA ? প্রাণ নেই এমন কিছু জিনিস মিশ খেয়ে তৈরি করলো নতুন রকম জিনিস— এমন কিছু যাতে প্রাণ আছে। এটা কিন্তু কারুর ইচ্ছেয় তৈরি হয় নি বা কেউ হাতে করে তৈরি করে দিয়ে যায় নি। এই পৃথিবীতেই যখন তৈরি হয়েছে প্রাণ, তখন তার কারণ খুঁজতে হবে এই পৃথিবীতেই। তার প্রথম ১০০ কোটি বছর বয়সের মধ্যেই ছিল এই প্রাণ সৃষ্টি করবার আয়োজন।

কেমন ছিল সেই ১০০ কোটি বছর বয়সে পৃথিবীর অবস্থা? তার বাতাসে ততোদিনে তৈরি হয়ে গেছে হাইড্রোজেন ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের গ্যাস, তাদের নাম অ্যামোনিয়া বা NH_3, মিথেন বা CH_4 আর জলীয় বাষ্প বা H_2O, যারা তৈরি হয়েছিল কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিশেলে। আবহাওয়াটা ছিল বেয়াড়া রকমের

খারাপ। তাছাড়া ঘন ঘন বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর গায়ে আছড়ে পড়ছে সূর্য থেকে আসা প্রচণ্ড শক্তিশালী আলো, যার নাম দেওয়া হয়েছে অতি-বেগুনি (Ultra-violet ray) আলো। এই সব রকমারি কাণ্ডের ফলে একটা সুবিধে হলো কি, এমন কিছু জিনিস একসঙ্গে মিশ খেয়ে জুড়ে গেল, যা স্বাভাবিক অবস্থায় কিছুতেই মিশ খেতো না। এমনিভাবে মিশ খেয়ে তৈরি হওয়া জিনিসেরাই হলো ওই অ্যামিনো অ্যাসিডেরা।

খুব আজগুবি, আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হচ্ছে? কিন্তু মোটেই আজগুবি নয়। ওই অ্যামিনো অ্যাসিডদের ঠিক অমনিভাবেই তুমিও তৈরি করতে পার। কি করে? তুমি যদি পৃথিবীর ১০০ কোটি বছর বয়সের সেই আবহাওয়া কোনোভাবে আজ তৈরি করে নিতে পারো কোথাও, আর ওইরমক শক্তির যোগান দিতে পার অতি-বেগুনি আলো আর বিদ্যুৎ দিয়ে, তবে তুমিও পারবে কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে ফেলতে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই এই কাণ্ড করেছেন।
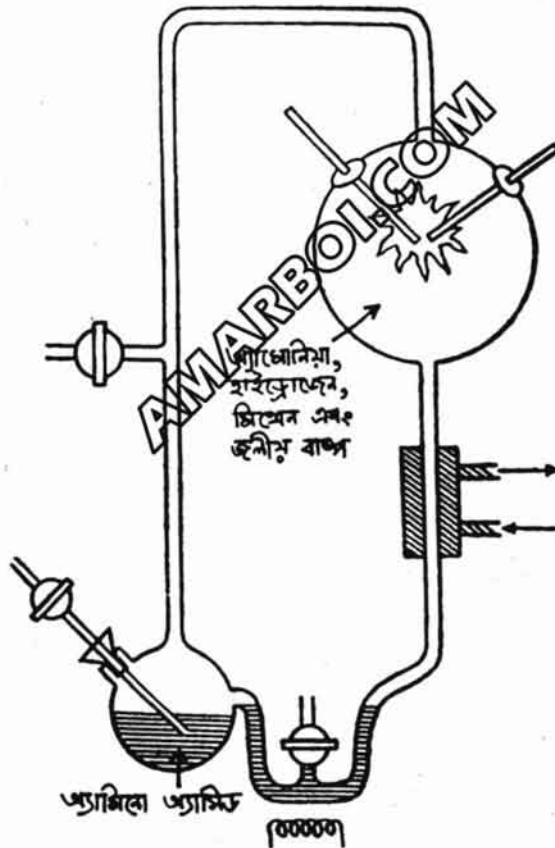
বিজ্ঞানী স্ট্যান্‌লি মিলারের পরীক্ষা : আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অবস্থা তৈরি করা হয়েছে কাচের পাত্রে–অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, মিথেন আর জল দিয়ে, খুব শক্তিশালি বিদ্যুৎ পাঠানো হয়েছে সেই পাত্রের মধ্যে ; পরীক্ষা শেষে যন্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেল প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে জরুরি কিছু অ্যামিনো অ্যাসিড।

এরপর কি হলো, তা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। কেটে গেল আরো অনেক অনেক বছর। পৃথিবীর বাতাসে ততোদিনে জমে উঠেছে অ্যামিনো অ্যাসিড আর নিউক্লিওটাইডের মতো প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে জরুরি কিছু অণু। ক্রমে ক্রমে এগুলো মিশে গেল পৃথিবীর ওপরকার সমুদ্রের জলে। আবহাওয়া তখনও খুবই গরম। তাই সব মিলে মিশে অবস্থাটা হলো যেন অনেক কিছু মালমশলা দিয়ে তৈরি বিশাল এক গামলা গরম ঝোল। এর পরের কাজটা সহজ করে দিল জলের অণুরা। কি করলো তারা? ওই ঝোলের মধ্যে থেকে কিছু কিছু অণুকে একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ঘিরে ফেললো। এতদিন যেসব অণুরা দূরে দূরে ছাড়া-ছাড়াভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারা এবার বাঁধা পড়ল একসঙ্গে অনেকে মিলে, জলের অণু দিয়ে ঘেরা ছোটো ছোটো ঘেরাটোপের মধ্যে। এই ছোটো ছোটো ঘেরাটোপের অবস্থাটাকেই বলা যায় প্রাণ সৃষ্টির গল্পের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়, যখন প্রাণ নেই এমন জিনিস থেকে তৈরি হচ্ছে এমন জিনিস, যার প্রাণ আছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, প্রাণ তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে হাতি ঘোড়ার দল ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। আসলে, প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হবার পর, পৃথিবীতে যে প্রাণী দেখা দিলো তার চেহারা নেহাৎই তাচ্ছিল্য করবার মতো। এতো ছোটো যে খালি চোখে টিকিও দেখা যায় না। আর তার না আছে মুখ, না আছে হাত-পা–তার শরীরের যে-কোনো জায়গাই যেন কখনো তার পা, কখনো তার মুখ, কখনো পেট! আজকের দিনের পানা পুকুরের জলে এই রকমের প্রাণীর সন্ধান মেলে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক হাজার গুণ বড়ো করে তাদের দেখা যায় আর বোঝা যায় তাদের হালচাল। এই রকমের প্রাণীর নাম দেওয়া হয় অ্যামিবা।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই ধরনের প্রাণীর শরীরে মাত্র একটি কোষ। তার মানে কী? কোষ আবার কাকে বলে?

আদিম পৃথিবীর সমুদ্রে সেই যে গরম ঝোলের কথা বলছিলাম, আর তার মধ্যে জলের অণু দিয়ে ঘেরা প্রাণ সৃষ্টির অধ্যায়ের ছোটো ছোটো ঘেরাটোপের কথা, সেই ছোটো ছোটো ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেই অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে জন্ম নিল যাকে বলে 'জীবকোষ'।

সব রকম প্রাণীর শরীরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশের নাম দেওয়া হয় 'কোষ'। মানুষের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত যোগাড় করো, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ঠিক মতো দেখো। দেখবে তার মধ্যে খুব ছোটো ছোটো কিন্তু আলাদা আলাদা অংশ রয়েছে। কিন্তু শুধু মানুষের শরীর কেন? পেঁয়াজ বলো, গরুর যকৃৎ বলো, পীচ ফলের বীজ বলো,– যে কোনোরকম জীবন্ত জিনিসের যে কোনো অংশকে ওইরকমভাবে পরীক্ষা করো না কেন, দেখতে পাবে তা তৈরি হয়েছে ওই রকম ছোট্ট ছোট্ট আর আলাদা আলাদা অংশ মিলে। এই অংশগুলোকে বলে 'কোষ'। তার মানে, সমস্ত মাটির পাত্রই যে-রকম শেষ পর্যন্ত মাটির দানা দিয়ে তৈরি, সেই রকম সমস্ত প্রাণীর দেহ-ই তৈরি হয়েছে কোষ দিয়ে। আবার আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবকিছুই কোটি কোটি কোষ দিয়ে তৈরি।

সমস্ত প্রাণীর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি; তবু প্রতিটি কোষকে আলাদা আলাদাভাবে এক একটা প্রাণী বলতে হবে। কেননা, প্রাণ বলতে যে-সব লক্ষণ বোঝায় প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেও সেই সব লক্ষণ রয়েছে। প্রত্যেকটি কোষ বাইরে থেকে নিজেদের জন্যে খাবার জোটায়, হজম করে সেই খাবার; সেই খাবারের পুষ্টিতে তাদের শরীর বাড়ে, খাবারের

মধ্যে যে-অংশটা শরীরের কাজে লাগে না সেই অংশ শরীর থেকে বার করে দেয়। তাছাড়া, একটি কোষ থেকে জন্ম হয় দুটি কোষের; দুটি থেকে আবার চারটির—এইভাবে বংশবৃদ্ধি।
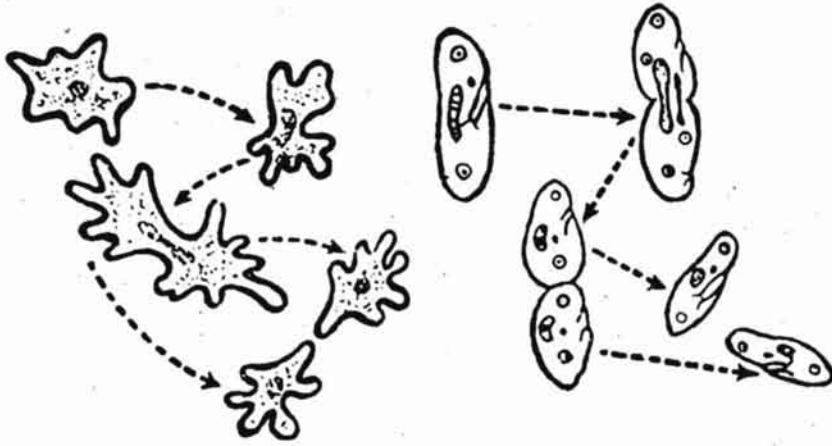
একটি কোষ থেকে দুটি কোষের জন্ম। তীরচিহ্নগুলি অনুসরণ করে দেখো।

কোষ অবশ্য এক রকমের নয়, হরেকরকমের। কোষ যত রকমেরই হোক না কেন, তার দেয়ালগুলো তৈরি হয়েছে প্রোটিন দিয়ে। দেয়ালঘেরা এই কোষের মাঝখানে ছোট্ট একটু ঘেরা অংশ হলো নিউক্লিয়াস আর বাকিটাকে বলে প্রোটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে সরু ফিতের মতো একরকমের লম্বা লম্বা জিনিস, তার নাম ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোম কার শরীরের কোষে কটা আছে তাই দিয়েই ঠিক হবে সে শেষ পর্যন্ত কি হবে, —হাতি, না মানুষ, না ইঁদুর। মানুষের শরীরের কোষে এই সংখ্যাটা হলো চব্বিশ জোড়া। এই ক্রোমোসোমের ফিতেগুলো তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো পুঁতির দানার মতো একরকমের দানা দিয়ে, যার নাম দেওয়া হয় 'জিন'। আর এই জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে DNA অণুরা যেন লম্বা লম্বা শেকলে বাঁধা অবস্থায়।

কি করছে সেখানে বসে DNA ? অনেক কাজ তার। আর তার কাজটাই আসল। কি সে কাজ? একনম্বর কাজ হলো, তুমি মানুষ হবে, না পাখি হবে, আর কেমনভাবে কী দিয়ে তোমার শরীর তৈরি হবে, তার আসল নক্সাটা তৈরি করা। আর দু-নম্বর হলো, কোষ ভাগাভাগির আসল কাজ। কিন্তু সেটা আবার কী? নিজের একটা হুবহু নকল তৈরি করে নতুন কোষের মধ্যে চালান করে দেওয়া, যাতে এই নকল DNA-টাই নতুন কোষের ভেতর ঘাপ্‌টি মেরে থেকে তার এক নম্বর নক্সা তৈরির কাজটা চালিয়ে যেতে পারে।

এক কোষওলা প্রাণীদের হদিস পাওয়া যায় আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে। তারপর, যুগের পর যুগ ধরে, নানানভাবে এই সব আদিম প্রাণীগুলো বদলে চলেছে। বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনের গাছপালা, আজকের দিনের পশু-পাখি। তার মানে, আজকের দিনের ঘোড়াই বলো আর ঘোড়সওয়ারই বলো, সব কিছুই।

কেন এমন বদলালো? কেননা, এই হলো দুনিয়ার নিয়ম।

এই দুনিয়ার এমন মজা

এই দুনিয়ার মজাই হলো ওই! এখানে সব কিছুই বদলে যায়। তার মানে, আগে যে-রকম ছিল সেই রকমটি আর থাকে না। অন্য রকম হয়ে যায়। এই বদলের একটুও বিরাম নেই।

এই তো সে বছর কিনে আনলুম একটা ছাতা। কুচকুচে কালো রঙ। টাকের ওপর সেই ছাতা বাগিয়ে যখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই তখন মনটা গর্বে যেন নেচে ওঠে—আড় চোখে চেয়ে দেখি আর পাঁচ জন চেয়ে দেখছে কি না। কিন্তু ও হরি! বছর তিনেক ঘুরতে না ঘুরতে দেখি আমার সেই নতুন ছাতাটা বদলে গিয়ে অন্য একটা ছাতা হয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল সেই কুচকুচে কালো রঙ, ঝলমলে সেই নতুন ছাতাটা! তার বদলে দেখি ছাতাটার রঙ হয়েছে ফ্যাকাশে হলদে মতো, চেহারাটা হয়েছে ধ্যাড়ধ্যাড়ে, নড়বড়ে-পুরনো ছাতার চেহারা যে-রকম হয়। হাতে নিতে ব্যাজার লাগে। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবি, কেউ চেয়ে দেখছে না তো! না দেখলেই ভালো। নেহাত টাক-ফাটা রোদ, নইলে, ওটাকে বয়ে বেড়াতে বয়ে যেতো।

ছিল নতুন চটকদার ছাতা। সেটা বদ্‌লে অন্য ছাতা হয়ে গেল। লক্কড় এক ছাতা।

কিন্তু কবে বদলালো? কখন বদলালো? —এই কথা ভেবে দেখতে গেলে একটু থতমত খেয়ে যাই। তাই তো! ছাতা-ছাড়া আমি এক পা-ও বেরোই না। তার মানে, রোজই ওই ছাতা হাতে বেরোচ্ছি। বেরোতে বেরোতে একদিন দেখি নতুন ছাতাটি আর নেই। অথচ, রোজই মনে হয়েছে সেই ছাতাটাই। এমন তো নয়, যে একদিন ভোর বেলা উঠে দেখলাম সেই নতুন ছাতাটা রাতারাতি বদলে গিয়ে একটা পুরনো ছাতা হয়ে গিয়েছে। তাহলে?

তাহলে মানতেই হবে ছাতাটা রোজই বদলেছে। কিন্তু এমনভাবে বদলেছে যে চোখে পড়ে নি। তার মানে, বদলটা বড় মিহি। এমন মিহি যে চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক বদলটা পুরোদমেই চলেছে। তার বিরাম নেই।

দুনিয়ায় বদলের শেষ নেই। বদলের বিরাম নেই। কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলো বদল আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে, কতকগুলো বদল আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। হয়তো একদিন শুরু হলো ভুমিকম্প ঃ পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে ঠিক্‌রে বেরোতে লাগলো আগুনের হল্‌কা, কাঁপতে শুরু করলো পৃথিবীর বুক, আর সেই কাঁপুনীতে চিড় খেয়ে দু-ফাঁক হয়ে গেল একটা পাহাড়, ফেটে চৌচির হয়ে গেল একটা বিরাট মাঠ। সকাল বেলায় উঠে দেখি পাহাড়টা যে-রকম ছিল সে-রকম আর নেই, মাঠটা যে-রকম ছিল সে-রকম আর নেই! বদলে গিয়েছে। অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। এই যে বদল, এ-বদলকে চোখে

দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু সব রকমের বদল এই রকমের নয়। কতকগুলো বদল এমন মিহি আর এমন আস্তে আস্তে হয় যে সেগুলোকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আজকে দেখলাম একটা ছেলে রাস্তায় ডাং-গুলি পিটছে। কিন্তু বছর কতক পরে দেখবো সেই ছেলেটা আর সেই ছেলেটা নেই। ফিটফাট এক ভদ্রলোক হয়ে গিয়েছে, গটগট করে আপিস চলেছে। তারপর, আরো কিছু বছর পরে যদি তাকে দেখি তাহলে দেখবো সেই মাঝবয়সী আপিসের বাবুও আর নেই। তার বদলে একটি বুড়ো থুত্থুড়ে লোক রোয়াকে বসে নাতিদের রূপকথা শোনাচ্ছে।

কিন্তু সেই ডাং-গুলি খেলোয়াড় বদলে গিয়ে কবে এই দাদু হয়ে গেল? নিশ্চয় রোজই বদলেছে, সব সময় ধরে বদলেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলেছে। কেবল বদলটা এমন মিহি যে চোখে ধরা পড়ে না।

পৃথিবীতে যতো সব গাছ-পালা, জীব-জন্তু, সব কিছুর বেলাতেই এই কথা। সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। অবিরাম বদলে যাচ্ছে। কেবল, সেই বদল এমন মিহি যে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে এই বদলটা শুধু কচি বয়েস বদলে বুড়ো বয়েস হয়ে যাবার মতো বদল নয়। কচি-বয়েস বদলে বুড়ো-বয়েস হবার কথা তো আছেই। তাছাড়াও আরো একরকম বদল আছে। সেইটাই দারুণ মজার। সেটা হলো, এক রকম জানোয়ার বদলে বেবাক আর এক রকম জানোয়ার হয়ে যাবার ব্যাপার। যেমন ধরো, অনেকদিন আগে এক রকমের জানোয়ার ছিল, সেগুলোকে যেন শেয়ালের মতো দেখতে। তাদের নাম দেওয়া হয় ইয়োহিপাস। অনেক হাজার বছর ধরে সেই জানোয়ারগুলোর বংশ বেড়ে চলেছে ঃ বাচ্চার পর বাচ্চা, আবার তার বাচ্চা, আবার তার বাচ্চা, তাদের বাচ্চা- এই রকম অনেক অনেক দিন ধরে। আর শেষ পর্যন্ত সেই অদল-বদলের ফলে ওই জানোয়ারদের চেহারা বদলে গিয়ে একেবারে অন্য-রকম হয়ে গেল। কী-রকম হয়ে গেল তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কেননা, আজকের দিনে যে-সব ঘোড়া চিঁহি চিঁহি করছে আর ঘাস খেয়ে ঘুরছে সেই ঘোড়াগুলোই হলো ওই অনেক হাজার বছর আগেকার শেয়ালের মতো দেখতে ছোটো ছোটো ইয়োহিপাসদের বংশধর।

ইয়োহিপাস থেকে আজকালকার ঘোড়া

দুনিয়ায় ক্রমাগতই এই রকম ব্যাপার চলেছে। এক রকমের জানোয়ার বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত অনেক হাজার বছর পরে একেবারে অন্য রকমের জানোয়ার হয়ে যায়। তবে জানোয়ারগুলোর দিকে তুমি-আমি এমনি যদি চেয়ে দেখি তাহলে এই বদলটা আমাদের চোখে পড়বে না। বড় মিহি এই বদল। কিন্তু, তুমি-আমি যদি চোখে দেখতে না পাই তাহলে এই বদলের খবরটা জোগাড় করলো কে? ওঃ, সে এক ভারি মজার ছেলে। তার নাম চার্লস ডারউইন।

এক যে ছিল অবাক ছেলে

বাপ বললে, পদ্য লিখতে শেখো। কিন্তু পদ্যলেখায় ছেলের মন নেই। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে যেটুকু বা লিখলো তা নেহাতই অচল, আজেবাজে পদ্য।

বাপ বললো, তাহলে ডাক্তারি পড়ো। কিন্তু ডাক্তারি পড়ায় ছেলের মন নেই। তাই ডাক্তারি শেখাও হয়ে উঠলো না।

তাহলে পাদরি হবার চেষ্টা দেখো, বাপ বললে। পাদরিদের কাছে লেখাপড়া শিখে পাদরি হবার ব্যবস্থা। কিন্তু পাদরি হওয়ায়ও ছেলের মন নেই। তাই এ-বিদ্যেও বেশি দূর গড়ালো না।

বাপ বললে, ওর দ্বারা কিস্‌সু হবে না। দিদি বললে, ওর দ্বারা কিস্‌সু হবে না।

কিন্তু দেখা গেল ওর দ্বারাই হলো। আর এমন দারুণ ব্যাপার হলো যা পালেপার্বণেও হয় না। কেননা, বড় হয়ে এই ছেলেটি যে-সব কথা আবিস্কার করলো তাই শুনে পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতদের মাথা একেবারে ঘুরে গেল।

ছোট্ট বয়েস থেকেই ছেলেটির দারুণ উৎসাহ পোকা-মাকড়, গাছপাতা আর পশুপাখির ব্যাপারে। পাখির ডিম খুঁজতে খুঁজতে সারাটা দিন কেটে যায়। ভোর বেলায় শিকারে বেরোবার কথা থাকলে মাথার কাছে জুতো জোড়া নিয়ে ঘুমোয়, রাত পোয়াতে না পোয়াতে জুতো পরে ফিটফাট। আর নতুন ধরনের কোনো পোকা-মাকড় দেখলে ছেলেটি আনন্দে যেন দিশেহারা হয়ে যায়। একবার হয়েছিল কি, ছেলেটি দেখলো একটা গাছের গুঁড়িতে তিনটে নতুন ধরনের পোকা। ছেলেটি দু-হাত দিয়ে খপ খপ করে দুটো পোকা ধরে ফেললো। এদিকে তিন নম্বরের পোকাটা পালিয়ে যায় যায়! কিন্তু দুটো হাতই যে দুটো পোকায় জোড়া। তাহলে? ছেলেটি করলো কি, খপ করে ডান হাতের পোকাটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে ফেললো আর ডান হাত দিয়ে চেপে ধরলো তিন নম্বরের পোকাটা। ছেলে-ধরার গল্প শুনেছো, কিন্তু এরকম পোকা-ধরা ছেলের গল্প কখনো শোনো নি নিশ্চয়ই।

ছেলেটির নাম চার্লস ডারউইন। প্রায় শ-দেড়েক বছর আগে –১৮০৯ খৃস্টাব্দে তার জন্ম।

ডারউইনের তখন বছর একুশ বয়েস। খবর এলো, বিগ্‌ল্‌ বলে একটা জাহাজ। পৃথিবী ঘুরতে বেরোচ্ছে। জলপথে দেশ-বিদেশে সওদাগরী জমাবার পথ বার করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন বলছেন, দেশবিদেশ ঘুরে বিজ্ঞানের খবর জোগাড় করতে কেউ যদি রাজি থাকে তাহলে তাকে এই জাহাজে নিয়ে ঘোরানো যেতে পারে। খবর পেয়ে ডারউইনের তো মহা উৎসাহ। অনেক রকম কাকুতি-মিনতি করে বাবাকে কোনো মতে রাজি করানো গেল। ডারউইন চললো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ডারউইনের থ্যাবড়া নাক দেখে ক্যাপ্টেন ভাবলো এর দ্বারা কিস্‌সু হবে না; একে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনেরও মন গললো। রওনা হলো বিগ্‌ল্‌।

এ-দেশ থেকে ও-দেশ। এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপ। পুরো পাঁচ বছর ওই জাহাজে। আর ডারউইন প্রাণ ভরে নানান রকমের ব্যাপার দেখতে লাগলো : পোকা মাকড় আর গাছ-পালা আর পশু-পাখি আর পাহাড়-পর্বত সংক্রান্ত ব্যাপার। নজর করবার মতো যা দেখে খুঁটিয়ে লিখে রাখে। আর সব খুঁটিয়ে দেখে বলেই যা আর পাঁচজনের চোখে পড়ে না তা ডারউইনের চোখে পড়ে।

তারপর বিগ্‌ল্‌ জাহাজ দেশে ফিরে এলো। কিন্তু ডারউইনের কাজের কামাই নেই, দেখার কামাই নেই। আরো বিশ বছর ধরে জন্তুজানোয়ার আর পোকামাকড় আর পাহাড়পর্বত আর গাছপালার ব্যাপার দেখা। জরুরি ধরনের যা কিছু দেখছে তাই লিখে রাখছে, লিখতে লিখতে খাতার পর খাতা ভরে যায়।

আর তারপর, এতো সব চোখে দেখা ব্যাপারের নজির নিয়ে বেরুলো ডারউইনের বই। সে-বই পড়ে পৃথিবীর সব পণ্ডিতদের মাথা একেবারে ঘুরে গেল। শুরু হলো দুনিয়া জোড়া হৈ-চৈ। এমন হৈ-চৈ আর কোনো বই নিয়ে পড়েছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এতো হৈ-চৈ কেন? কী লেখা আছে ওই বইতে?

হৈ-চৈ তো হবেই। কেননা, এর আগে পর্যন্ত সবাই যে-কথা ভাবতো, যেকথা মানতো, ডারউইন প্রমাণ করে দিলেন সেসব একদম ভুল কথা। এর আগে পর্যন্ত সবাই ভাবতো, পৃথিবীর বুকে এতো যে সব লক্ষ লক্ষ প্রাণী তা সবই ভগবানের সৃষ্টি। ভগবান সৃষ্টি করেছেন হাতি আর ঘোড়া, ব্যাঙ আর রাজহাঁস আর শুঁয়োপোকা আর নটে শাক —সব কিছুই আলাদা করে সৃষ্টি করা। তার মানে, মানুষের সঙ্গে শুঁয়োপোকার কিম্বা ব্যাঙের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ হলো এক রকম আর ব্যাঙ হলো আর এক রকম। এক্কেবারে আলাদা।

ডারউইনের বইতে প্রমাণ হয়ে গেল, মোটেই তা নয়। এখন এই যে এতো রকম জীবজন্তু আর গাছপালা —এগুলোকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, একথা বলবার কোনো মানে হয়না। কেননা, আসল ব্যাপারটা হলো একেবারে অন্য রকমের ব্যাপার। অনেক অনেক বছর ধরে আদিম প্রাণীরা নানান দিকে নানানভাবে বদলাতে বদলাতে আজকের দিনের এতো সব লক্ষ লক্ষ রকমের প্রাণী হয়ে গিয়েছে। তার মানে, আজকের দিনে এতো রকম সব প্রাণীর একই পূর্বপুরুষ।

কিন্তু প্রমাণ কী?

প্রমাণ আসলে অনেক রকমের।

ডারউইনের বইতে অনেক রকম প্রমাণ আছে।

তাছাড়া, ডারউইনের পর আরো অনেকে আরো অনেক রকম ব্যাপার দেখেশুনে আরো নানান-রকম প্রমাণ জোগাড় করেছেন।

সে-সব প্রমাণের কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

কঙ্কালে কঙ্কালে ভাইভাই

আমরা যাকে বলি 'আগুন'। হিন্দিভাষীরা তাকেই বলে 'আগ'। এই দুটো কথার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। তার মানে, একই কথা থেকে এই দুটো কথা এসেছে। সেই কথাটা হলো 'অগ্নি', সংস্কৃত কথা। তার থেকেই বাংলায় হয়েছে 'আগুন', হিন্দিতে 'আগ'। তার জন্যেই 'আগুন' আর 'আগ' এই দুটো কথার মধ্যে অতোখানি মিল, যেন ভাই-ভাই ভাব।

প্রাণীদের বেলাতেও অনেকটা এই রকম। ধরো একটা শিম্পাঞ্জী আর একটা মানুষ। এদের মধ্যে কি খুব বেশি মিল আছে? যদি থাকে তাহলে মানতে হবে এদের মধ্যেও যেন একরকম ভাই-ভাই সম্পর্ক। তার মানে একই জানোয়ার থেকে এসেছে এই দু-রকমের জানোয়ার। যেমন, 'অগ্নি' থেকে এসেছে 'আগুন' আর 'আগ', দুটো কথাই।

কিন্তু মিল কোথায়? এমনিতে চোখে দেখলে মনে হয় একদম আলাদা। শিম্পাঞ্জীর গায়ে লোম, চারপায়ে হাঁটে। মানুষের লোমও নেই, আবার হাঁটে দু-পায়ে। তাহলে? আসলে কিন্তু তা নয়। এমনিতে যতো তফাতই মনে হোক না কেন, এদের দুজনের দুখানা কঙ্কাল দেখো। দুটো কঙ্কালের গড়নই অনেকখানি একরকম। কঙ্কালে কঙ্কালে যেন ভাই-ভাই সম্পর্ক।

তার থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, এদের দু-জনেরই পূর্বপুরুষ এক ছিল। আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে-রকম সম্পর্ক অনেকটা সেই রকমই। আমাদের দু-জনেরই ঠাকুর্দা এক।

মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর সেই যে এক পূর্বপুরুষ সে হলো এক রকমের বনমানুষ। সেরকম বনমানুষ আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই বনমানুষের বংশধররাই নানান দিকে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত কেউ বা হয়েছে শিম্পাঞ্জী, কেউ বা হয়েছে মানুষ। তাই মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর কঙ্কালের এমন ভাই-ভাই ভাব। কিন্তু ধরো, একটা মানুষ আর একটা ব্যাঙ। এমনিতে তো মনে হয় দুজনের মধ্যে কোনো রকমই মিল নেই। কিন্তু তাই বললেই কি হয়? তাদের কঙ্কাল দুটো ভালো করে দেখো, দুজনের কঙ্কালের গড়নে যে মিল রয়েছে তা মানতে বাধ্য হবে। তার মানে, ব্যাঙের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু সেটা হলো বড়ই দূর সম্পর্ক। যেমন ধরো, তোমার

ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার যে জ্যেঠতুতো ভাই তার নাতির নাতির সঙ্গে তোমার যেমন সম্পর্ক। কাছেপিঠের সম্পর্ক নিশ্চয়ই নয়; তবু সম্পর্ক যে একেবারে নেই তাও তো বলা চলবে না।
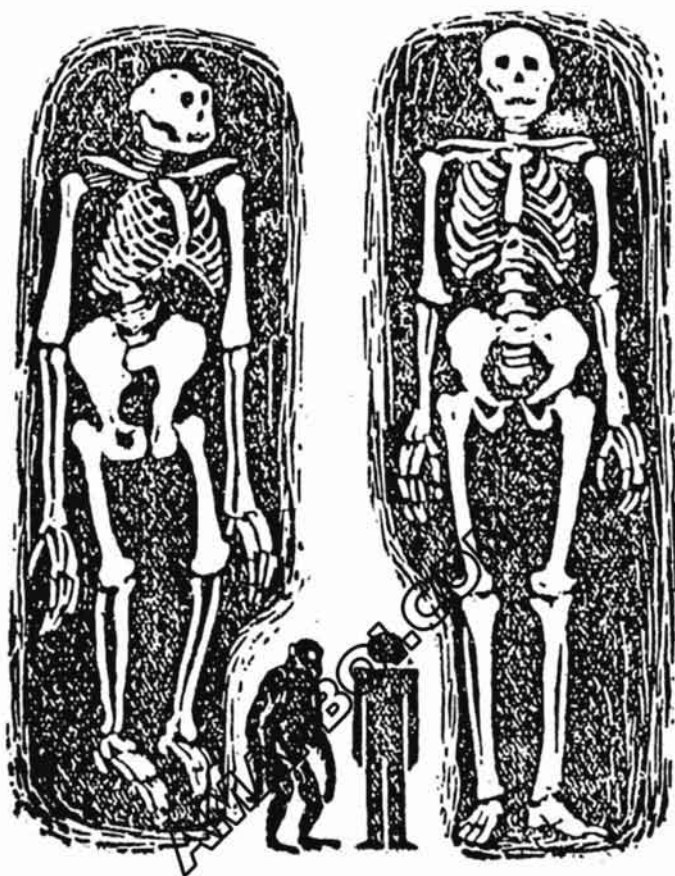
দুটো কঙ্কালে কি ভীষণ মিল দেখো

তার মানে, আমাদের অনেক অনেক আগেকার এক পূর্বপুরুষ আর ব্যাঙদের পূর্বপুরুষ একই ছিল। সেই পূর্বপুরুষদের নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে। তাদের নাম মাছ। কেননা মাছরাই হলো পৃথিবীর প্রথম শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী। অনেক লক্ষ বছর ধরে এই শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের নানান দল নানান দিকে বদলাতে কেউ বা হয়েছে ব্যাঙ, কেউ বা হয়েছে খরগোস, কেউ বা গণ্ডার, আবার কেউ বা হয়েছে বাঁদর। এই রকম কতোই রকম। তারমানে, এই সব জানোয়ারদের মধ্যে আত্মীয়তা রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে। কারোর কারোর বেলায় সম্পর্কটা খুব দূর সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে গণ্ডারের সম্পর্কটা নেহাতই দূর সম্পর্ক। কিন্তু গণ্ডারের সঙ্গে শুয়োরের সম্পর্কটা বেশ কাছে-পিঠের সম্পর্ক, যে রকম কাছে-পিঠের সম্পর্ক হলো মানুষের সঙ্গে গেরিলা আর শিম্পাঞ্জী আর ওরাঙ ওটাঙ-এর সম্পর্ক।

এদের সবাইকার কঙ্কালগুলো ভালো করে মিলিয়ে দেখলে কথাটা না-মেনে আর উপায় থাকে না।

তোমার যখন লেজ ছিল

এইবারে তুমি নিশ্চয়ই রীতিমতো ক্ষেপে উঠবে। শিম্পাঞ্জীই হোক, গরিলা হোক, ওরাঙওটাঙই হোক আর বানরই হোক, ওদের গাগুলো তো লোমে ভর্তি। আবার কারুর লেজও আছে। আর ওদের সঙ্গে তোমার কি না খুব কাছেপিঠের সম্পর্ক! এ কথা শুনলে মেজাজ বিগড়ে যায় না কি?

তা হয়তো যায়। কিন্তু কথা হলো, মেজাজ বিগড়ে লাভ নেই। কেননা লেজই বলো আর লোমই বলো-এ সবকে ঘেন্না করেই বা কী হবে? এককালে, তোমার গায়েও লোম ছিল, তোমার পেছনেও একটি ছোট্ট লেজ ছিল। কবে জানো? তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের মধ্যে ছিলে। তাই তখনকার কথা কিছুই তোমার মনে নেই। কিন্তু ছিল। লেজও ছিল, লোমও ছিল। তখন তোমার চেহারাটা এত্তোটুকু-এক ইঞ্চির তিন ভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু এইটুকু চেহারার তুলনায় তোমার লেজটি বেশ বড়সড়োই। পুরো শরীরটা লম্বায় যতোখানি, তার ছ-ভাগের এক ভাগ হলো তোমার লেজ। পেটের মধ্যে যখন তোমার পাঁচ সপ্তাহ বয়েস তখন এই লেজটি দেখা দিয়েছে, কিন্তু বড় হতে হতে তুমি যখন আট সপ্তাহের হলে তখন ওই লেজটা মিলিয়ে গেল।
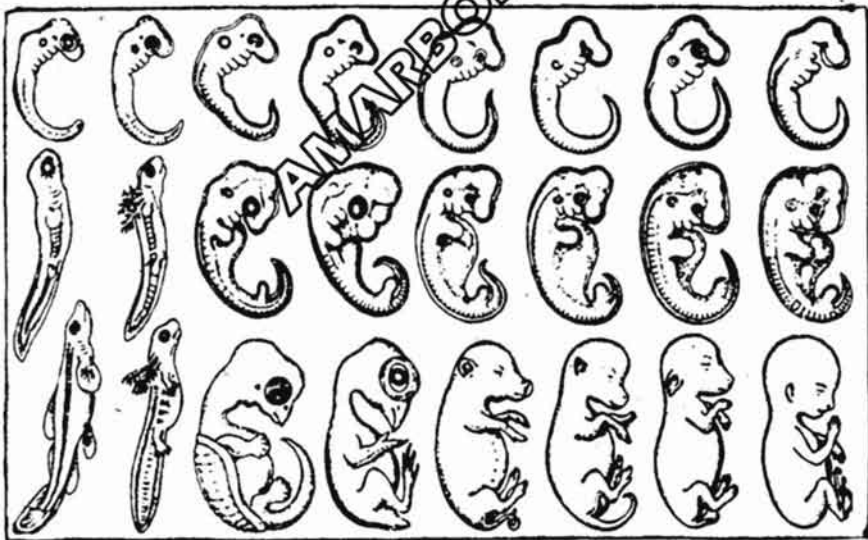
মাছ গিরগিটি কচ্ছপ মুরগি শুয়োর গরু খোরগোস মানুষ

এদের ডিম ফুটে বাচ্চা জন্মায় এদের সরাসরি বাচ্চা জন্মায়]

[ডিম ফুটে বেরোয় আর সরাসরি বাচ্চা হয় (যেমন স্তন্যপায়ী, এমন কটি প্রাণীর জন্মের আগের তিন অবস্থা। এই অবস্থায় মাছের খুদেদের যেমন লেজ আছে, ছবিতে দেখো খুদে মানুষটারও লেজ আর কানকো আছে। মজা হলো, সব কটা খুদে প্রাণীরই লেজ আছে, আর চেহারার কি ভীষণ মিল! (ছবির প্রথম সারিটা দেখো)

শুধু লেজ নয়। লোমও ছিল। মার পেটের মধ্যে যখন তোমার সাতমাস বয়েস তখন তোমার সারা গা লোমে ভরতি। সোনালী রেশমি লোম। তারপর জন্ম হবার ঠিক মুখোমুখি সময়েই গা থেকে এই সব লোম ঝরে গিয়েছে।

শুধু লেজ আর লোম কেন? মাছদের কান্‌কো কাকে বলে জানো তো? মাথার দুপাশে দুটো যন্ত্র যা দিয়ে মাছরা নিঃশ্বাস নেয়। তুমি কি জানো যে এককালে তোমার নিজের শরীরেও এই রকমের কান্‌কো ছিল? কী করে জানবে বলো? তখনো যে তুমি তোমার মায়ের পেটের মধ্যে!

আসলে, যে-সব জানোয়ারের পূর্বপুরুষ এক আর যাদের মধ্যের সম্পর্কটা বেশ কাছেপিঠের, তারা যখন তাদের মায়ের পেটের মধ্যে কিম্বা ডিমের মধ্যে থাকে, তখন তাদের চেহারায়ও আশ্চর্য মিল। এই মিল থেকেই প্রমাণ হয় তাদের পূর্বপুরুষ এক। তার মানে, একই জানোয়ার পৃথিবীর বুকে নানানভাবে বদলাতে বদলাতে নানান রকমের জানোয়ার হয়ে গিয়েছে! মার পেটের মধ্যে কিম্বা ডিম ফুটে বেরুবার আগে কার কী রকম চেহারা তা আগের পাতার ছবিটা থেকেই আন্দাজ করতে পারবে। ছবিতে দেখো ঃ মাছ, মুরগি, আর মানুষের ছানা-পৃথিবীতে পা দেবার আগে কার কেমন চেহারা। এবার তুমি নিজেই বলো, খুব কিছু তফাত আছে কি?

পাহাড়ের বই

পৃথিবীর বুকে অনেক পাহাড়। অনেক রকমের পাহাড়। তার মানে, সব পাহাড় এক রকমের নয়। এতো রকম পাহাড়ের মধ্যে এক রকম পাহাড়ের নাম হলো পাললিক পাহাড় বা পলিপড়া পাহাড়। এই পাহাড়গুলো এক রকম বইয়ের মতো। তার মানে নিশ্চয়ই কাগজের ওপর কালি দিয়ে ছাপা জিনিস নয়। তবু বইয়ের মতোই। যেন ইতিহাসের বই। কেননা, ইতিহাসের বই থেকে অনেক যুগের অনেক রকম খবর পাওয়া যায়। রাজা অশোক কবে জন্মেছিলেন, কী রকমের লোক ছিলেন। কিংবা, কী রকম ছিল আমাদের দেশের অবস্থা নবাবী আমলের আগে। এই রকম সব পুরনো খবর জোগানোই তো ইতিহাসের বইয়ের আসল কাজ। পাললিক পাহাড়গুলোর বেলাতেও ঠিক তাই। এগুলোর মধ্যে থেকেও অনেক অনেক খবর পাওয়া যায়, বহুদিন আগেকার সব খবর।

ছ-কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে কোন্ ধরনের জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো? আজকাল যে-রকম ঘোড়া আমাদের গাড়ি টানছে, তখনকার কালে কি সেই রকমের ঘোড়া ছিল? আজকাল জানতে পারা গিয়েছে —না, সেকালে মোটেই এরকমের ঘোড়া ছিল না। তখনকার কালে পৃথিবীর কোথাও এ-রকম ঘোড়ার চিহ্ন ছিল না। তার বদলে ছিল এই ঘোড়াদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু সেই পূর্ব-পুরুষদের দেখতে একেবারে অন্য রকম। আগেই বলেছি ছোটোখাটো শেয়ালের মতো তাদের চেহারা, মাটির থেকে তাদের পিঠ বড় জোর এক হাত উঁচু হবে। আর তাছাড়া এদের পায়ে ঘোড়ার খুর ছিল না; তার বদলে সামনের পায়ে চারটে করে আঙুল আর পেছনের পায়ে তিনটে করে আঙুল। একেবারে অন্যরকমের চেহারা নয় কি? ঘোড়ার এই পূর্বপুরুষদের নাম ইয়োহিপাস। তার মানে, ছ-কোটি বছর

ধরে নানানভাবে বদলাতে বদলাতে সেই ইয়োহিপাসের বংশধররা আজকালকার ঘোড়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু জানা গেল কোথা থেকে? ওই পাহাড়ের বই থেকে। যেগুলোর নাম দেওয়া হয় পাললিক পাহাড়। কিন্তু কেমন করে জানা গেল? এ-কথার উত্তর বুঝতে গেলে প্রথমে ভেবে দেখতে হবে এই পাহাড়গুলো জন্মালো কেমন করে।

তুমি তো জানোই, পৃথিবীর সমস্ত নদী বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু নদীগুলোর স্রোত সবজায়গায় সমান জোর নয়। যেখানে ঢালুর দিকে স্রোত সেখানে তোড় খুব বেশি; যেখানে সমতল জমি, কিংবা যেখানে স্রোতের মুখে কোনো বাঁধা নেই, সেখানে তোড় অনেক কম।

[পাহাড়ের ভাঁজ। থাকে থাকে মাটি জমে পাললিক পাহাড় তৈরি হয়েছে। একেকটা থাক যেন বইয়ের একেকটা পাতা; তাতে ওই থাকটার বয়স আর আরো হাজারো রকমের দামী খবরের খোঁজ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে আস্ত জন্তু হয়তো চাপা পড়েছে, পরে তা ফসিল হয়ে গেছে। ওপরের ছবিতে আমাদের দেশের হিমাচল প্রদেশের স্পিতি অঞ্চলের পাললিক পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে।]

এখন ব্যাপারটা হলো এই যে নদীগুলো খালি হাতে সমুদ্রের দিকে ছুটছে না। পৃথিবী ধুয়ে, পৃথিবীর বুক থেকে নানান রকমের জিনিস বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। মাটি আর ধাতু, গাছ-পাতা, শামুক গুগ্‌লি, মরা জন্তু জানোয়ার-এমনি কতো কি। স্রোতের তোড়টা যেখানে কম সেখানে নদীর মধ্যেকার এই সব জিনিসগুলো থিতিয়ে মাটিতে জমতে থাকে। এইভাবে, অনেকদিন ধরে বেশ পুরু একথাক জিনিস নদীর তলায় থিতিয়ে বসলো। তারপর আবার অনেকদিন ধরে তার ওপরে থিতিয়ে বসলো আর এক থাক। এইভাবে, যুগের পর যুগ ধরে থাকের পর থাক জমতে থাকে। তারপর, ওপরের দিকের থাকগুলোর চাপে তলার দিকের থাকগুলো আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়। সেই পাথরের যে পাহাড় তারই নাম হলো পাললিক পাহাড়।

[শিরদাঁড়াওয়ালা পাখি আর্কিওপটেরেক্স। এই ফসিলটা ইউরোপের বাভরিয়ায় পাওয়া গিয়েছিল। পাথরে জমা অবস্থায় পাখিটার কঙ্কালের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা পুরো পাখিটা দেখতে কেমন হবে তা আন্দাজ করেছেন। ছবির ওপরের অংশে পাখিটার চেহারাটা। সারা পৃথিবী জুড়েই, এখন আর পাওয়া যায় না এমন অজস্র প্রাণীর কঙ্কাল, হাড় ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকে বিজ্ঞানীরাও ওই সব প্রাণীর চেহারা, তারা কি খেতো, কতোদিন আগে তারা পৃথিবীতে ছিল, এ-রকম অনেক দরকারী খবর বের করে ফেলেছেন। দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর ধারে আদিম যুগের প্রকাণ্ড জন্তু ডাইনোসরের একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল —সেটা এখন রাখা আছে কলকাতারই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্‌টিটিউট-এ।]

পাললিক পাহাড়গুলোকে তাই দেখতে ভারি মজার ধরনের। যেন একটা পাথরের চাদরের ওপর আর একটা পাথরের চাদর, তার ওপর আর একটা-এই রকম উপরি উপরি, থাকে থাকে সাজানো। এই রকমের পাহাড় দেখেছো কখনো? দেখতে পাওয়া এমন কঠিন নয়। কিন্তু মনে রেখো, যেখানেই এই রকমের পাহাড় সেখানেই বহুযুগ আগে হয় নদী ছিল, না হয় সমুদ্র ছিল। ভূমিকম্প-টুমিকম্পর মতো অনেক রকম রসাতল তলাতল কাণ্ড হয়ে পৃথিবীর ওপরকার চেহারাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। সমুদ্র সরে গিয়েছে, নদী সরে গিয়েছে, আর জেগে উঠেছে ওই সব পাললিক পাহাড়।

এই পাললিক পাহাড়গুলোর আগাগোড়া বয়েস সমান নয়। যতো চূড়োর দিক ততো বয়েস কম, যতো নিচুর দিক ততো বয়েস বেশি। তা তো হবেই। কেননা, যতো ওপরের দিক ততোই নতুন পাথরের থাক। নানান রকম কায়দাকানুন করে এই পাললিক পাহাড়গুলোর বয়েস বের করে ফেলা যায়। পাহাড়গুলোর বয়েস মানে কোন্ থাকটার কতো বয়েস তাই।

আরো মজার ব্যাপার আছে। পাহাড়গুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় একরকমের জিনিস, সেগুলোকে বলে ফসিল।

ফসিল আবার কী? পাললিক পাহাড়গুলোর মধ্যে যেন নানানরকমের মূর্তি ঠাসা রয়েছে। কোনোটা ঠিক গাছের পাতার মতো, কোনোটা বা [illegible] শামুকের মতো, কোনটা বা মাছের মতো, অন্য কোনো জীবজন্তুর হাড়ের মতো কোনোটা বা। হরেক রকম সব জিনিস। পাথরের তৈরি হুবহু মূর্তির মতো। এইগুলোকেই বলে ফসিল। যদি কখনো যাদুঘরে বেড়াতে যাও তাহলে নিজের চোখে দেখে এসো ফসিলগুলো কী রকম দেখতে হয়। যাদুঘরে অনেক সব ফসিল সাজানো থাকে।

কিন্তু কথা হলো, এগুলো এলো কোথা থেকে? আগেই বলেছি, নদীগুলো পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে ধুয়ে নিয়ে যায় হরেক রকমের জিনিস। এইসব জিনিসের মধ্যে গাছ পাতা রয়েছে, শামুক গুগ্‌লি রয়েছে, রয়েছে নানান রকম জীবজন্তুর মরা শরীর। যেখানে নদীর স্রোত একটু থিতিয়েছে, সেখানে নদীর জলের সঙ্গে মেশানো সব জিনিসগুলো নদীর তলার দিকে জমতে শুরু করে ঃ বালি, মাটি, নানান রকমের ধাতু। সেইগুলো জমতে জমতেই তো শেষ পর্যন্ত পাললিক পাহাড় হয়। তাই এই সব জিনিসগুলো যখন মাটির তলায় থিতিয়ে বসছে তখন তার সঙ্গে নিশ্চয়ই থেকে যাচ্ছে কিছু কিছু গাছ পাতা, কিছু কিছু শামুক গুগ্‌লি কিছু কিছু মরা মাছ, মরা জন্তু-জানোয়ারের শরীর। এতো সবের মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগই পচে যায়। সেগুলোর আর কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু নানান কারণে কতকগুলো পচে না নষ্ট হয় না। তার বদলে পাথর হয়ে যায়। যেগুলো পাথর হয়ে যায় সেগুলোরই নাম হলো ফসিল। ঠিক যেমনটি গাছের পাতা ছিল তেমনটিই দেখতে রয়েছে, কেবল পাথর হয়ে গিয়েছে। তাই মনে হয় যেন পাথরের মূর্তি। নিখুঁত মূর্তি।

কিন্তু, কেমন করে পাথর হয়ে গেল? মনে আছে তো, আগেই বলেছি প্রত্যেক প্রাণীর শরীর খুব সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম একরকম অংশ দিয়ে গড়া, সেই অংশগুলোর নাম হলো 'কোষ'। এখন ভেবে দেখো নদীর তলায় থিতিয়ে জমা একটা মাছের শরীরের কথা। ওই ভাবে থিতিয়ে যাবার পর তার শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম, তাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে বসে নানান রকম খনিজ জিনিস। ফলে, কোষগুলোর গড়ন

ঠিক থাকে —কেবল ভেতরের মালমশলাটা বদলে যায়। এইভাবে প্রত্যেকটা কোষের ভেতরকার মালমশলা যখন বদলে গেল তখনও পুরো মাছটার চেহারা মাছের মতোই রইলো, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গড়া মাছ নয়— পাথরের মাছ। ফসিল। আজো যদি একটা ফসিল থেকে খুব পাতলা একটা টুকরো কেটে নেওয়া যায় আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যায় ওই টুকরোটাকে, তাহলে তার মধ্যেকার কোষগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। এ-কোষ পাথরের তৈরি।

এইবারে ভেবে দেখো পাললিক পাহাড়গুলোর কথা। ওপর ওপর আর থাকে থাকে সাজানো পাথরের স্তর। কোন্ স্তরের বয়েস কতো তা জানতে পারা গিয়েছে। আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নানান স্তরে নানান রকম ফসিল। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় কোন্ যুগে পৃথিবীর বুকের ওপর কোন্ ধরনের প্রাণীদের বাস ছিল, বুঝতে পারা যায় যুগের পর যুগ ধরে বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, কোন্ কোন্ প্রাণী শেষ পর্যন্ত আজকের পৃথিবীর প্রাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খুদেদের রাজত্ব

কোন্ প্রাণীর চেহারা সবচেয়ে খুদে তা বলতে পারো? হাতির চেয়ে ঘোড়ার চেহারাটা অনেক ছোটো, ঘোড়ার চেয়ে ঢের ছোটো চেহারা হলো কোলাব্যাঙের। আবার কোলাব্যাঙের চেয়ে মশার চেহারা আরো ছোটো। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখো তাহলে দেখবে এই মশার শরীরেরও অনেক অনেক কোষ। অজস্র কোষ মিলে গড়ে তুলেছে একটা মশা, প্রত্যেকটি কোষই কিন্তু এক একটি জীবন্ত জিনিস, এক একটি প্রাণী।
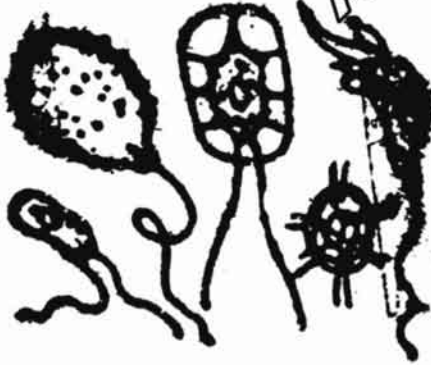
তাহলে, সবচেয়ে ছোটো চেহারার প্রাণীটা কে? যদি কারো পুরো শরীরটা শুধুমাত্র একটা কোষ দিয়ে তৈরী হয় তাহলে নিশ্চয়ই তাকেই বলবো সবচেয়ে খুদে প্রাণী। আজকের দিনেও এই রকমের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু আজকের দিনে পুরো পৃথিবী জুড়ে তাদের রাজত্ব নিশ্চয়ই নয়। কেননা, আজকের দিনে পৃথিবীতে অনেক মস্ত মস্ত চেহারার প্রাণীও রয়েছে। বটগাছ, হাতি, ঘোড়া, মানুষ, কতোই না। কোটি কোটি কোষ মিলে তৈরি করেছে এদের সব শরীর, তাই এদের চেহারা এমন বিরাট বিরাট।

পৃথিবীর বয়েস হয়েছে, ৪৫০ কোটি বছর। খুব সম্ভব তার মধ্যে প্রথম ১০০ কোটি বছর সময়ে পৃথিবীতে কোনো রকম প্রাণীরই চিহ্ন ছিল না। তার মানে, পৃথিবীতে প্রাণী দেখা দিয়েছে পৃথিবীর জন্ম হবার অনেক অনেক পরে। কিন্তু সেই যে প্রথম প্রাণী তাদের চেহারা নেহাতই খুদে খুদে। কেননা, মাত্র একটা করে কোষ দিয়ে তাদের পুরো শরীরটুকু

গড়া। অনেক অনেক কোটি বছর ধরে পুরো পৃথিবী জুড়ে শুধু এই খুদে খুদে প্রাণীদের রাজত্ব!

আজকের দিনেও এই রকমের খুদে খুদে প্রাণী রয়েছে আর নানানভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাদের হালচাল। কী রকম হালচাল জানো?

তাদের না আছে মুখ, না আছে পেট, না হাত-পা-মাথা-মুণ্ড। কিংবা, তাদের পুরো শরীরটাকেই পা বলতে পারো, পুরো শরীরটাকেই পেট বলতে পারো, মুখও বলতে পারো। কেননা এগিয়ে চলবার যখন দরকার হয়, তখন তারা শরীরের যে কোনো অংশকে সামনের দিকে একটুখানি যেন ঠেলে দেয় তারপর বাকি শরীরটা যেন গড়িয়ে যায় এই ঠেলে দেওয়া অংশটার মধ্যে। যখন একটা খাবারের দানা জোটে, তখন তারা পুরো শরীরটা দিয়ে এঁকেবেঁকে তালগোল পাকিয়ে যেন জড়িয়ে ধরে খাবারটুকুকে, তারপর খাবারটুকু শুষে নেয় শরীরের মধ্যে। তাই পুরো শরীরটাই মুখ, পুরো শরীরটাই পেট। আবার এই সব প্রাণীদের বাচ্চাও হয়। কিন্তু কিরকমভাবে জানো? বাইরের থেকে খাবার দাবার জোগাড় করে শরীরের তো পুষ্টি জোগালো। শরীরটা বেশ বড়সড় হলো। মোটাসোটা হলো। তারপর হলো কি, পুরো শরীরটা আস্তে আস্তে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। ফলে হয়ে গেল দুটো আলাদা আলাদা প্রাণী। একটা থেকে জন্ম হলো দুটোর। ১৬ পাতার ছবিটা মনে আছে তো?

অনেক অনেক বছর ধরে পৃথিবীর বুক জুড়ে শুধু এই ধরনের খুদে খুদে জীব, যাদের পুরো শরীর বলতে শুধু একটি করে কোষ। তারপর হলো কি, —সে এক ভারি মজার কাণ্ড। এই সব খুদে খুদে জীবগুলো যেন দল পাকাতে শুরু করলো, একজোট হতে লাগলো। যতো দিন যায় ততোই দেখা যায় নতুন নতুন ধরনের প্রাণী হচ্ছে, তাদের শরীর আর শুধু একটা কোষ দিয়ে তৈরি নয়, একটার বদলে যেন একদল কোষ। আর যতোই দল পাকায় ততোই শরীরটাকে চালাবার জন্যে কাজের ভার যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তার মানে, যতোদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা কোষ দিয়ে পুরো শরীরটা গড়া, ততোদিন পর্যন্ত পুরো শরীরটা দিয়েই খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, বাচ্চা-পাড়া —সব রকমের কাজ। তখন নানান রকম কোষের ঘাড়ে নানান রকম কাজের দায় ঃ একদলের ওপর খাওয়াদাওয়ার ভার, একদলের ওপর চলাফেরার ভার, একদলের ওপর বাচ্চা পাড়ার ভার —এই রকম হরেক রকম, আর এইভাবেই ক্রমশ তৈরি হলো সেই খুদে খুদে জীব থেকে বড় বড় জীবের শরীর।

ওই সব অল্প কোষ তৈরি আদিম খুদে খুদে প্রাণীদের ফসিল কিন্তু পাওয়া গেছে। সেগুলো প্রায় ৩৫০ কোটি বছরের পুরনো। আর অনেকগুলো কোষ দিয়ে বানানো বড় বড় যে-সব প্রাণীদের ফসিল পাওয়া গেছে তাদের বয়স অতো বেশি নয়। বড়জোর ১০০ কোটি বছর হবে।

মাছ আর মাছখেকো মানুষ

মাছ নইলে তোমার তো চলে না। ভাতের পাতে এক টুকরো মাছ যদি না জোটে তা হলে তোমার মুখেই রুচবে না। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা মাছের নামে ওয়াক তুলবে। যেমন

ধরো, গুজরাটিদের কথা। বেশির ভাগ বাঙালীরই মাছ নইলে চলে না; বেশির ভাগ গুজরাটিরই মাছের গন্ধে ওয়াক ওঠে।

কিন্তু বাঙালীই বলো আর গুজরাটিই বলো —মাছ না হলে কারুর পক্ষেই আর পৃথিবীর মুখ দেখা হতো না। কেননা, মাছই হলো মানুষের একেবারে আদিম পূর্বপুরুষ। তার মানে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একদল মাছ নানানভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মাছই বা এলো কোথা থেকে? আর, মাছ বদলে শেষপর্যন্ত মানুষই বা হলো কেমন করে? মানুষের কথা পরে, আগে বলি, মাছ এলো কোথা থেকে।

প্রথমে তো সেই খুদে খুদে প্রাণী। পুরো শরীরটাই যাদের শুধু একটা কোষ দিয়ে গড়া। তারপর, অনেক কোষ মিলে দল পাকিয়ে এক একটা প্রাণীর শরীর গড়তে লাগলো। এইভাবে বদলাতে বদলাতে জলের তলায় দেখা দিল শ্যাওলা আর সবুজ ছোটো ছোটো গাছ; শেষপর্যন্ত এরাই হলো আজকের দিনের এতো রকম গাছ-গাছড়ার আদি পুরুষ।

কিন্তু অনেক কোষ মিলে ক্রমশ গড়ে তুলতে লাগলো আরো নানান রকম প্রাণীর শরীর। হরেক রকম পোকা, কেঁচো, ঝিনুক, শামুক, কতোই না। কিন্তু এদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সেরা তাদের নাম দেওয়া হয় ট্রাইলোবাইট। প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে শুধু এদেরই রাজত্ব। জল থেকে সহজেই এরা খাবার জোগাড় করতে পারে। এদের গায়ের ওপর পুরু একটা খোলস, তাই অল্প বিপদে এরা মরে না। তাছাড়া এরা বাচ্চা পাড়ে দেদার —তার মধ্যে অনেক বাচ্চা যদিও মরে যায়, তাহলেও ওদের বংশ ঠিক রক্ষা হয়। আজকের দিনেও এদের কিছু কিছু বংশধর পৃথিবীতে টিকে রয়েছে, যেমন ধরো কাঁকড়াবিছে আর মাকড়সা। কিন্তু তবুও বলা যায় এই ট্রাইলোবাইটদের গল্প বহুদিন আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। কেননা প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে প্রায় একচেটিয়া রাজত্ব করবার পর ট্রাইলোবাইটদের বংশ শেষপর্যন্ত লোপ পেলো।

কিন্তু এই ট্রাইলোবাইটদের বংশ আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেলেও ইতিমধ্যে পরিস্কার জলের নিচে একরকম নতুন ধরনের প্রাণী গড়ে উঠতে লাগলো। এদের নাম অষ্ট্রাকোড্রাম। এদের মুখগুলো ছুঁচোলো মতো, কিন্তু মুখের মধ্যে চোয়াল বলে কিছু নেই, তাই চিবিয়ে খেতে এরা জানে না। কাদার মধ্যে ছুঁচোলো মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে খাবার শুষে খায়। কিন্তু চোয়াল না থাকুক, ওদের শরীরে একটা দারুণ দরকারি জিনিস ছিল। সেই জিনিসটার নাম হলো মগজ। মগজ কাকে বলে জানো নিশ্চয়ই। মাথার খুলির মধ্যে নরম মতো একরকম জিনিস থাকে, তাকেই বলে মগজ। শেষ পর্যন্ত এই মগজের দরুনই আমরা কানে শুনতে পাই, চোখে দেখতে পাই —মগজ না থাকলে চোখ থেকেও আমরা অন্ধ হতাম, কান থাকলেও কালা হতাম। শুধু তাই নয়। আমাদের মগজের দরুনই আমাদের এতো বুদ্ধিশুদ্ধি। অবশ্য তোমার আমার —তার মানে মানুষদের-মগজগুলো খুব ভালো আর বেশ

বড়। তাই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি এতো বেশি। সেই প্রাচীনকালের অষ্ট্রাকোড্রামদের মগজ দেখা দিলেও, সে-মগজ নেহাতই সামান্য আর আমাদের তুলনায় তুচ্ছ। তাই, ওদের মাথায় যে বুদ্ধিশুদ্ধি খুব ছিল তা মোটেই সত্যি কথা নয়। তবু, মগজ তো দেখা দিলো। আর এই মগজের গুণেই আশপাশের বাকি সব জীবদের তুলনায় এরা হলো অনেক উঁচুদরের জীব।

তারপর প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর পর এদের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে শেষপর্যন্ত হয়ে গেল আসল আর খাঁটি মাছ। মাছদের শরীরে মগজ ছাড়াও অনেক রকম দারুণ দরকারি জিনিস রয়েছে। যেমন ধরো, একটা শিরদাঁড়া; এরকম পরিস্কার শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী এর আগে পৃথিবীতে আর দেখা দেয় নি। আজকের দিনে অবশ্য অনেক জানোয়ারের শরীরেই স্পষ্ট শিরদাঁড়া রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা সবাই শেষপর্যন্ত ওই মাছদেরই বংশধর। মাছরাই হলো পৃথিবীর প্রথম শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী। শিরদাঁড়া ছাড়াও মাছদের মুখের মধ্যে চোয়াল থাকায় ওরা চিবুতে শিখলো। গায়ে পাখনা থাকায় পাখনা নেড়ে আর লেজ নেড়ে জলের মধ্যে ওরা ঘোরাফেরা করতে শিখলো। যেন দেখতে দেখতে সমুদ্র ভরে গেল মাছে মাছে। তারপর প্রায় ছ-কোটি বছর ধরে জলের বুকে মাছদেরই একচেটিয়া রাজত্ব।

ডাঙায় ওঠার পালা

মনে রাখতে হবে, যখন থেকে মাছদের যুগ শুরু হয়েছে তখন থেকেই ডাঙার ওপর দেখা দিয়েছে সবুজের চিহ্ন। তার মানে, লতা-পাতা, ঘাস-গাছ। কিন্তু আজকালকার মতো লতাপাতা গাছপালা নয়। আজকালকার এই সব গাছ-গাছড়ারই পূর্বপুরুষ, কিন্তু সেগুলোর শেকড়-টেকড় নেই, মাটির ওপর কেমন ভেসে বেড়াচ্ছে! এইগুলোর বংশধররাই বদলাতে বদলাতে শেষপর্যন্ত আজকালকার গাছপালা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, মনে রাখতে হবে পুরো মাছদের যুগ ধরে ডাঙার ওপর গাছপালা আর তাদের পূর্বপুরুষ ছাড়া আর কোনো রকম প্রাণীদেরই চিহ্ন নেই। ডাঙার ওপর জীবজন্তু দেখা দিয়েছে অনেক পরে।

সবচেয়ে প্রথম ডাঙায় যে-সব জীবজন্তু দেখা দিলো তারা মাছদেরই বংশধর। তাই জল থেকেই তারা উঠে এলো। ডাঙায় উঠে এলো বটে, কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক তারা ছাড়তে পারলো না। তাই তাদের খানিকটা জীবন জলের মধ্যে, আর খানিকটা জীবন ডাঙার ওপর। পুরোপুরি ডাঙার জীব তাদের বলা চলে না। তাদের বলে উভচর ঃ তার মানে জলেও চলে, স্থলেও চলে। যেমন ধরো, আজকালকার ব্যাঙগুলো। ব্যাঙগুলো কি পুরোপুরি ডাঙার জীব? মোটেই নয়। ব্যাঙগুলো কি পুরোপুরি জলের জীব? তাও নয়। তাহলে? দু-জায়গারই জীব। তার মানেই উভচর।

উভচররা পুরোপুরি ডাঙার জীব হতে পারলো না কেন? তার কারণ তাদের ডিমগুলো। নরম তুলতুলে তাদের ডিম। ডাঙায় সেই ডিম পাড়লে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ডিম পাড়বার জন্যে জলের মধ্যে ফিরে না গিয়ে উপায় নেই। যদি পারো তাহলে আজকালকার ব্যাঙের ডিম জোগাড় করো। দেখবে কী রকম নরম জিনিস। জলের মধ্যে না থাকলে ডিমগুলো স্রেফ নষ্ট হয়ে যাবে।

তার মানে, মাছদের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে উভচর হয়ে গেল। তারা ডাঙাতেও থাকতে পারে, জলের মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু কথাটা শুনতে যতো সহজই লাগুক না কেন, ব্যাপারটার মধ্যে এক দারুণ হাঙ্গামা আছে।

হাঙ্গামাটা যে কী রকম তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পারো। জল থেকে একটা জ্যান্ত মাছ তুলে ডাঙায় ছেড়ে দাও, দেখবে খানিকক্ষণের মধ্যেই মাছটা খাবি খেয়ে মরে যাচ্ছে। কেন ওরকম মরে যায়? আমাদের ডাঙায় ছেড়ে দিলে তো আমরা ওরকম মরে যাই না!

তার আসল কারণ হলো, আমাদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস বলে একটা জিনিস আছে। মাছদের ফুসফুস নেই।

ফুসফুস আবার কী? ডাঙার ওপর বাঁচতে গেলে ফুসফুসের দরকার পড়ে কেন?

ডাঙায় চলাফেরা করবার সময় আমরা বুকভরে নিঃশ্বাস নিই। তার মানে, বাইরে থেকে খানিকটা হাওয়া বুকের মধ্যে টেনে নিই। তারপর আমরা নিঃশ্বাস ফেলি। তার মানে, বুকের মধ্যে থেকে হাওয়াটা বার করে দিই। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজা আছে। ঠিক যে হাওয়াটা বাইরে থেকে আমরা ভেতরে টেনে নিলাম সেইটেই আবার বের করে দিই না। তার মধ্যে থেকে খানিকটা জিনিস যেন ছেঁকে নেওয়া হলো। শরীরের জন্যে, তারপর বাকিটুকু নিঃশ্বাস ফেলে বের করে দেওয়া হলো। যে জিনিসটুকু ছেঁকে নিয়ে শরীরের ভেতর রেখে দেওয়া হলো তার নাম অক্সিজেন। বাইরের হাওয়ায় অক্সিজেন রয়েছে। অক্সিজেন না হলে শরীর বাঁচে না। কিন্তু কথা হলো শরীরের মধ্যে আমরা কেমন করে হাওয়ার থেকে অক্সিজেনটুকু আলাদা করি? তার কারণ ওই ফুসফুস। ফুসফুস শরীরের মধ্যেকার ভারি আশ্চর্য এক যন্ত্র। এ যন্ত্র দিয়ে হাওয়ার মধ্যেকার অক্সিজেন ছেঁকে নেওয়া যায়। মাছদের শরীরের মধ্যে এ-রকম যন্ত্র নেই। ডাঙায় তুললে মাছ তাই খাবি খেয়ে মরে যায়।

কিন্তু তাহলে জলের মধ্যে মাছরা বাঁচে কেমন করে? কোথা থেকে পায় অক্সিজেন? জলের মধ্যে থেকে পায় নিশ্চয়ই। কেননা জলের সঙ্গে মিশেল আছে অক্সিজেনের। আর মাছদের শরীরে ফুসফুস না থাকলেও আর একটা যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র দিয়ে ওরা জলের থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নেয়। এই যন্ত্রটার নাম হলো কান্‌কো। মাছদের কান্‌কো দেখেছো তো? মাথার দুপাশে দুটো কাটা জায়গা, টেনে ফাঁক করে দেখলে দেখবে টুকটুকে লাল। আসলে হয় কি জানো? মাছরা যখন জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে তখন ক্রমাগতই হাঁ করে করে মুখের মধ্যে তারা জল পুরছে। তারপর এই জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের কানকোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কায়দা আছে। কান্‌কো দুটো এমনই মজার যন্ত্র যে তার মধ্যে দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার সময় জলের সঙ্গে মেশানো অক্সিজেনটুকু শরীরের জন্যে ছেঁকে রেখে দেওয়া হয়।

তাহলে সমস্যাটা কী রকম দেখো। মাছদের ফুসফুস নেই। ফুসফুস না থাকলে ডাঙায় বাঁচা যায় না। এদিকে মাছদেরই একদল বংশধর হয়ে গেল উভচর। তারা ডাঙায় বাঁচতে পারে। কেমন করে হলো?

আসলে মাছদের যুগে যে-সব মাছদের বাস, মোটের ওপর তারা দু-রকমের। এক রকম হলো, হাঙর ধরনের মাছ। তাদের কঙ্কাল ঠিক হাড়ের তৈরি নয়; তরুণাস্থি বলে একরকম নরম হাড় ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি। আর অন্য ধরনের যে মাছ তাদের কঙ্কালগুলো হাড় দিয়েই তৈরি।

এখন, এককালে হয়েছিল কি জানো? এই যে-সব হাড়ের কঙ্কাল-ওয়ালা মাছ, এদের শরীরের মধ্যে সত্যিই ফুসফুস গজিয়েছিল। তখন যদি তাদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস না গজাতো তাহলে তাদের পক্ষে বাঁচাই সম্ভব হতো না। কেননা, তখনকার দিনে পৃথিবীর আবহাওয়াটাই ছিল অন্য রকমের। যখন বৃষ্টি, তখন দারুণ বৃষ্টি। কিন্তু যখন অনাবৃষ্টি তখন এমন দারুণ অনাবৃষ্টি যে সবকিছু শুকিয়ে খাক হয়ে যাবার জোগাড়। অনাবৃষ্টির সময় জল শুকিয়ে পালে পালে প্রাণী মরতে শুরু করে, জলের মধ্যে পচতে থাকে তাদের শরীর, আর তাই ওই জলের মধ্যে থেকে অক্সিজেন জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো জলের ওপর মুখ তুলে ওপরের হাওয়া থেকে অক্সিজেন জোগাড় করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই অবস্থায় যে-সব মাছরা জলে থেকেও জল থেকে মুখ তুলে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিতে পারতো, শুধু তারাই টিকে যাবে। মাছেদের মধ্যে এরকম একদল কিন্তু ছিলই যাদের এতোদিন অন্য মাছেদের থেকে আলাদা করে চেনা যায় নি। কিন্তু এখন অবস্থা বদলে যাবার ফলে শুধুমাত্র জল থেকে অক্সিজেন টানে যে সব মাছরা তারা মারা পড়তে লাগলো দলে দলে। আর অন্যদিকে পালে পালে বাড়তে থাকলো ওই হাওয়া থেকে অক্সিজেন টেনে নেওয়া মাছের দল। এরকম মাছের দেখা কিন্তু খুব কম হলেও আজও মেলে, যারা কানকো আর ফুসফুসের কাজ দুটোই সমানভাবে চালাতে পারে। এদের নাম হলো সিলাকান্থ।

পৃথিবীর আবহাওয়া আবার বদলালো। দেখা গেল পরিস্কার জলের জায়গা অনেক রয়েছে, তার সঙ্গে দেদার অক্সিজেন মেশানো। এতোদিন পালে পালে মারা পড়ছিল যে-সব শুধু-কান্‌কোওয়ালা মাছরা, জলে অক্সিজেনের জোগান বাড়ায় তারা আবার দিব্যি বাড়তে লাগলো।

সে যাই হোক, এখন উভচরদের রহস্যটা বুঝতে পারছো তো? যে-সব হাড়ওয়ালা মাছদের শরীরে এককালে ফুসফুস গজিয়েছিল তাদেরই বংশধর হলো ওই উভচরের দল। তাই উভচরদের শরীরেও ফুসফুস, আর তাই উভচররা বাঁচতে পারে, পারে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে।

দুঃস্বপ্নের যুগ

তারপর শেষ হয়ে এলো ওই উভচরদের যুগ। সে আজ প্রায় ৩০ কোটি বছর আগেকার কথা। খাঁটি উভচর বলতে আজকাল ব্যাঙ-ট্যাঙ ধরনের শুধু দু-একরকম প্রাণী চোখে

পড়ে। বেশিরভাগই গিয়েছে মরে। তবে, উভচরদের একরকম বংশধর আজো আমরা দেদার দেখতে পাই। এই বংশধরদের নাম দেওয়া হয় সরীসৃপ! সরীসৃপ কাদের বলে জানো? যারা বুকের ওপর ভর দিয়ে চলে তাদের বলে সরীসৃপ। যেমন ধরো, আজকের দিনের সাপ, কিম্বা টিকটিকি। কারুর বা পা নেই, কারুর বা পা আছে। কিন্তু ওদের বেলায় এইটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, বুকের ওপর ভর দিয়ে হাঁটবার কথা।

তার মানে, উভচরের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত সরীসৃপ হয়ে গেল। সরীসৃপরা কিন্তু পুরোপুরি ডাঙার জীব, উভচরদের মতো এক-পা জলে নয়। তার মানে, উভচররা যা পারে নি সরীসৃপরা তা পারলো —জলের মায়া একেবারে কাটিয়ে আসতে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেমন করে পারলো? তার আসল কারণ হলো সরীসৃপদের ডিমগুলো। এদের ডিমের ওপর শক্ত খোলস, উভচরদের মতো তুলতুলে নরম ডিম নয়। আর তাই ডিম পাড়বার জন্যে জলে ফিরে যেতে হয় না। ডাঙার ওপরেই ডিম পাড়তে পারে, ডিমের ওপর তা দিতে পারে।

সরীসৃপদের শরীরে এ-ছাড়াও আরো কয়েক রকম সুবিধে। ঘোরাফেরা করবার ব্যাপার নিঃশ্বাস নেবার ব্যাপারে, নানান ব্যাপারে সুবিধে। তাই দেখতে দেখতে পৃথিবীর বুক অনেক অজস্র রকম সরীসৃপে ভরে যেতে লাগলো। তার মানে, উভচরদের বংশধররা নানানভাবে বদলাতে বদলাতে নানান রকমের সরীসৃপ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। কারুর-বা পাগুলো খুব মজবুত, দিব্যি হেঁটে বেড়াতে পারে। কারুর-বা শরীর থেকে পায়ের চিহ্ন বেবাক মুছে গেল। যেমন ধরো সাপ। কারুর-বা পাগুলো বদলাতে বদলাতে নৌকার দাঁড়ের মতো হয়ে গেল। তারা ফিরে গেল জলের ভেতর। আবার কারুর শরীরে গজালো চামড়ার ডানা। আজকালকার বাদুড় দেখেছো তো? তাদের যেরকম ডানা আছে অনেকটা সেই রকম। এই সব সরীসৃপেরা চামড়ার ডানা দিয়ে আকাশে উড়তে শুরু করলো। অবশ্য তাই বলে এই উড়ো-সরীসৃপরাই আজকালকার পাখির পূর্বপুরুষ নয়। আজকালকার পাখি সরীসৃপদেরই বংশধর, কিন্তু অন্য আর এক রকম সরীসৃপদের —ওই চামড়ার ডানাওয়ালা উড়ো সরীসৃপদের নয়।

এতো রকম সরীসৃপদের মধ্যে সবচেয়ে জমকালো গল্প যাদের নিয়ে তাদের নাম দেওয়া হয় ডাইনোসার। এমনসব অতিকায় জানোয়ার পৃথিবীর বুকে আর কখনো জন্মায় নি। আজকালকার হাতিগুলোও তাদের পাশে ছেলেমানুষ যেন। মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো এক একটি চেহারা! অনেকদিন ধরে চললো এই ডাইনোসারদের যুগ, এক দুঃস্বপ্নের যুগ যেন! দু-চার রকম ডাইনোসরের নমুনা দিই। এক রকম ডাইনোসরের নাম হলো ডিপ্লোডোকাস। লম্বায় ৫৮ হাত। কিন্তু নিরামিষ খায়। বুদ্ধিটাও নেহাত মোটা ধরনের কেননা এমন বিরাট চেহারা হলেও মাথার মগজটা ছোট্ট, একটা মুরগির ডিমের মতো। মানুষের সঙ্গে তুলনা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে মগজটা কতোটুকু। মানুষের শরীর মাত্র সাড়ে তিন হাত লম্বা, কিন্তু মগজের ওজন প্রায় দেড় কেজি। তার মানে গোটা তিরিশ ডিপ্লোডোকাসের মগজ এক করলে একটি মানুষের মগজের সমান ওজন হবে। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিতে মোটেই সমান হবে না। তারা যে বোকা সেই বোকাই থাকবে। আর একরম ডাইনোসরের নাম হলো ব্রাসিওসরাস। তাদের ওজন কতো জানো? প্রায় সতের হাজার

কেজি। গলাটা এতো লম্বা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকালকার যে-কোনো তিন-তলা বাড়ির ছাদটা উঁকি মেরে দেখে নিতে পারতো!

আর একরকম ডাইনোসর-এর নাম হলো টিরেনোসরাস। এ যেন স্বয়ং যমদূত। লম্বায় উনিশ ফুট, সামনের পা দুটো ছোটো ছোটো, পেছনের পা দুটো থামের মতো। দাঁতগুলো মূলোর মতো, এতোখানি হাঁ, ল্যাজের ঝাপটায় জঙ্গল কাঁপে। এতো বিরাট মাংসখেকো জানোয়ার পৃথিবীতে আর কখনো জন্মায় নি। তাই টিরেনোসরাস যখন শিকারে বেরোত তখন অন্যসব অতিবড় ডাইনোসরও ভয়ে একেবারে থরহরি কম্পমান।

এই রকম অনেক রকমের ডাইনোসর। অনেক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর ওপর এদেরই দুর্দান্ত দাপট।

কিন্তু অমন বিরাট বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা হলে কি হয়, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে ওরাও আর টিকতে পারলো না। শুধু পড়ে রইলো ওদের কঙ্কালগুলোর কিছু কিছু ফসিল।

কিন্তু কেন? কেন ওরা টিকতে পারলো না?

সে আজ প্রায় আট কোটি বছর আগেকার কথা। পৃথিবীর বুকের ওপর শুরু হলো এক রসাতল তলাতল কাণ্ড। মস্ত মস্ত জলাভূমিগুলো শুকিয়ে গিয়ে খাঁ-খাঁ করতে লাগলো, মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো বিরাট বিরাট পাহাড়ের চূড়ো! উত্তর শিয়র থেকে বইতে শুরু করলো শুকনো আর ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় শুকিয়ে মরে যেতে লাগলো গরম জায়গার গাছপালাগুলো।

পৃথিবীর চেহারাটাই গেল বদলে। এর আগে পর্যন্ত যে-রকম অবস্থা ছিল ডাইনোসরদের পক্ষে সেইটেই খাসা। কেননা, এই সব বিভীষিকার মতো বড় বড় জানোয়ারদের অনেকেই থাকতো জলার মধ্যে গা-ডুবিয়ে, খেতো জলা জায়গার গাছপালা, বাঁচতো ভিজে আর গরম হাওয়ায়। পৃথিবীর চেহারা বদলে গিয়ে নতুন যে চেহারা হলো

তার মধ্যে এরা বাঁচবে কেমন করে? নতুন অবস্থার সঙ্গে ওরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে আর পারলো না।

আর তাই শেষ হলো ওই দুঃস্বপ্নের দিন, শেষ হলো সরীসৃপদের যুগ। তারপর?

ডিম নয় আর

এদিকে, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুকে আর এক রকম জানোয়ার দেখা দিয়েছে। ইঁদুরের মতো ছোট্ট তাদের চেহারা। তার মানে ডাইনোসরদের তুলনায় একেবারে কিছু নয়। তবুও, ওই বিরাট বিরাট জানোয়ারদের সঙ্গে এক রকম জ্ঞাতি সম্পর্ক। কেননা, সরীসৃপদেরই এক আদিম বংশধরের দল নানানভাবে বদলাতে বদলাতে শেষপর্যন্ত এই নতুন ধরনের জানোয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যে নতুন ধরনের জানোয়ার এদের নাম স্তন্যপায়ী।

এদের শরীরে অনেক রকম নতুন সুবিধে। এদের গাগুলো লোমে ঢাকা, আর তাছাড়া এদের রক্তকে বলে গরম-রক্ত। গরম-রক্ত কাকে বলে জানো? আসলে জন্তু জানোয়ারদের রক্ত দু-রকমের। এক রকম জানোয়ার আছে যাদের রক্ত সব সময় সমান গরম থাকে। তার মানে, বাইরের আবহাওয়াটা গরমই হোক আর ঠাণ্ডাই হোক তাতে বিশেষ কিছু এসে-যায় না, শরীরের ভেতরকার রক্তটা সমান গরমই থাকে। কিন্তু আর একরকম জানোয়ারদের বেলায় অন্য রকম। আবহাওয়ার সঙ্গে তাদের রক্তের তাপ ওঠানামা করে। তার মানে, আবহাওয়াটা খুব ঠাণ্ডা হলে তাদের রক্তও খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়; আবহাওয়াটা বেশ গরম থাকলে তবেই শরীরে রক্তটা গরম থাকে। এদের বলে ঠাণ্ডা-রক্তওয়ালা জানোয়ার।

পৃথিবীর বুকে বাঁচতে গেলে ঠাণ্ডা রক্তের চেয়ে গরম-রক্ত ঢের বেশি সুবিধের। শীতের সময় রক্ত যদি হিম হয়ে যায় তাহলে তো মহা বিপদ! পৃথিবীর আবহাওয়া তো সমান নয়। কোথাও খুব ঠাণ্ডা, কোথাও বা খুব গরম। কখনো খুব ঠাণ্ডা, কখনো-বা খুব গরম।

স্তন্যপায়ীদের আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো রকমের জানোয়ার তাদের সবাইকার রক্তই ঠাণ্ডা-রক্ত। এমন কি ওই বিরাট বিরাট ডাইনোসরদেরও তাই। আর তাই, প্রায় আট কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যখন ওই রকম রসাতল কাণ্ড শুরু হলো, স্যাঁতস্যাঁতে আর গরম হাওয়ার বদলে বইতে শুরু করলো হিম শুকনো হাওয়া —তখন স্তন্যপায়ীর দল বেঁচে গেল। তাদের গায়ের ওপরটা লোমে ঢাকা, তাদের গায়ের ভেতরটায় গরম-রক্ত।

অবশ্য এছাড়াও স্তন্যপায়ীদের আরো নানান সুবিধে ছিল। ওদের মাথার মধ্যেকার মগজগুলো অনেক ভালো, তাই ওরা অনেক বেশি হুঁশিয়ার আর অনেক বেশি সজাগ।

ওদের দাঁতগুলো, ওদের পা গুলো অনেক ভালো, শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থাটাও অনেক ভালো।

আর তাছাড়াও আরো একটা সুবিধে। মস্ত বড় সুবিধে সেইটা। স্তন্যপায়ীদের বেলায় শেষ হলো ডিম পাড়বার পালা। ডিম পাড়বার বদলে একেবারে তৈরি বাচ্চা পাড়বার ব্যবস্থা।

সরীসৃপরা পর্যন্ত সমস্ত জীবজন্তুই ডিম পাড়তো। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতো। কিন্তু ডিম পাড়বার নানান হাঙ্গামা। ডিমগুলো একটু-আধটুতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ডিম পাড়বার জন্যে সুবিধেমতো জায়গা পাওয়া চাই। তারপর ডিম পাড়বার পরই তো আর হাঙ্গামা চোকে না। ডিমগুলো দেখাশুনা করা, নিয়ম করে তা দেওয়া, তা দিয়ে দিয়ে বাচ্চা ফোটানো।

এতো সবের বদলে, যদি একেবারে তৈরি বাচ্চা পাড়া যায় তাহলে কতো সুবিধে ভেবে দেখো। তাছাড়াও কিন্তু আরো ব্যাপার আছে! ডিম না হয় পাড়া গেল, ডিমের ওপর তা দিয়ে না হয় বাচ্চাও ফোটানো গেল। কিন্তু তারপর? বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে হবে তো। তার মানে, বাচ্চা ফোটাবার পর বাচ্চাদের জন্যে আবার খাবার জোগাড় করো রে! কিন্তু স্তন্যপায়ীদের বেলায় এ-হাঙ্গামা নেই। কেননা স্তন্যপায়ীদের মায়ের শরীরের মধ্যেই বাচ্চাদের জন্যে দুধ তৈরি হবার ব্যবস্থা। সেই দুধ খেয়েই বাচ্চারা বড় হবে। আসলে, স্তন্যপায়ী নামটার মানেই তাই। মা-র বুক থেকে দুধ খেয়ে বড় হয়, তাই ওই নাম।

অবশ্য, শুরুর দিকের স্তন্যপায়ীদের চেহারা নেহাতই তুচ্ছ। কিন্তু ওদের শরীরে এতো রকম সুবিধে বলেই দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে ওদের দাপট শুরু হলো। সরীসৃপদের যুগের পর স্তন্যপায়ীদের যুগ শুরু।

সর্বপ্রথম যে-সব স্তন্যপায়ীরা দেখা দিলো তাদের বংশধররা নানান দিকে নানানভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত হরেক রকম জানোয়ার হয়ে গেল। আকাশে বাদুড়, ডাঙায় সিংহ, হাতি, জেবরা, জিরাফ, জলের তলায় মাছখেকো মাছ ঃ শুধু তাই নয়। স্তন্যপায়ীদের একদল বংশধর গাছের ডালে বাসা বাঁধলো।

স্তন্যপায়ীদের এই বংশধরগুলির নাম দেওয়া হয় প্রাইমেট। প্রাইমেটদের আবার নানান রকম বংশধর। একদিকে হরেক রকমের বাঁদর আর হরেক রকমের বনমানুষ। অন্যদিকে একদল যারা আধা বনমানুষ আধা মানুষ। এই আধা মানুষদের নাম হলো হোমিনিড। এই বনমানুষদের আবার হরেক রকম বংশধর। কারুর নাম ওরাঙ ওটাঙ, কারুর নাম শিম্পাঞ্জী, কারুর নাম গরিলা। আর ওই আধা মানুষ হোমিনিডদের বংশধর শুধু মানুষ। তার মানে আমরা।

চার পা ছেড়ে দু-পা

সেই সব প্রাইমেট-যাদের একদল বংশধরের নাম হলো বনমানুষ —আজকের পৃথিবীতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি, ওই সব আধামানুষ হোমিনিডরা-যাদের একদল বংশধরের নাম হয়েছে শুধু মানুষ —আজকের দিনে তাদেরও আর দেখা নেই।

কিন্তু কথা হলো, বনমানুষের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত কেমন করে মানুষ হয়ে গেল?

মনে রাখতে হবে, এই সব বনমানুষদের আড্ডা ছিল গাছের ওপর। তাদের গায়ে লোম, মুখে লোম, আর তাদের ছিল চারটে করে পা।

কিন্তু গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবার সময় এই চারটে পায়ের মধ্যে খানিকটা তফাত দেখা দিলো। কেননা, গাছে থাকতে গেলে সামনের পা-জোড়া কাজে লাগে অনেক বেশি। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরা থেকে শুরু করে ফলমূল জোগাড় করা, ফলমূল মুখে পোরা, সব কিছু ব্যাপারেই পেছনের পায়ের চেয়ে সামনের পা-জোড়ার কাজ অনেক বেশি।

তারপর হলো এক ভারি অবাক কাণ্ড। এমনতরো অবাক কাণ্ড দুনিয়ায় খুব কমই ঘটেছে। ওই চারপেয়ে বনমানুষদের মধ্যে একদল বনমানুষ গাছের বাসা ছেড়ে নেমে এলো সমান জমির ওপর। চার পা ছেড়ে দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ওপরে মানুষের হাত, নিচে মানুষের পা, হাতে-পায়ে কতো তফাত দেখো!

ওপরে গরিলার হাত আর তলায় গরিলার পা। মানুষের তুলনায় কতো স্থূল দেখো!

কি জন্য নেমে এলো তারা মাটিতে? আরো ভালো খাবারের জন্য। এই খাবার জোগাড় করবার জন্য তার থাবার মুঠোয় ধরা থাকতো পাথরের টুকরো, যা দিয়ে তারা মাটি খুঁড়তো, আর মাটি খুঁড়ে তুলে আনতো শেকড়-বাকড়। তাহলে ওই পাথরের টুকরোটাকে তো হাতিয়ার বলতে হয়। আর হাতিয়ার ধরতে পারে যে থাবা সেটা মোটেই আর বনমানুষের থাবা নয়। সেটা ওই আধা-মানুষের 'হাত'। সে অনেক বছর আগেকার কথা। নিদেনপক্ষে এক কোটি বছর তো হবেই। কেমন ছিল তখনকার পৃথিবী চেহারাটা?

আবহাওয়াটা আবার বদলাতে শুরু করলো। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করলো আর তার সঙ্গে অনেক জায়গায় পুরু হয়ে জমতে লাগলো বিশাল বিশাল বরফের চাদর। এই ঠাণ্ডায় আগেকার ওই বিশাল ঘন বন-জঙ্গল সব মুছে সাফ হয়ে যেতে লাগলো। আর ওই জঙ্গলের অধিবাসী যতো জানোয়ারের দল পালাতে লাগলো দলে দলে এমন জায়গার খোঁজে যেখানে গিয়ে বাঁচা যাবে।

সেই অবস্থায় বেঁচে গেল কিন্তু একদল। ওই আধা-মানুষ হোমিনিডরা। কি করে? আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওদের, সবরকম খারাপ অবস্থার সঙ্গে কোনোমতে মানিয়ে চলবার, আর তাই টিকে যাবার। মাটির ওপর দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হেঁটে-চলে বেড়ানো তো শুরু হয়েই গেছে, সেই সঙ্গে এসে গেছে ওই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে নতুন নতুন হাতিয়ার, আর সেই হাতিয়ার ধরতে ওস্তাদ 'হাত'।

ওই আধা-মানুষ থেকে আমরা যে মানুষ হয়েছি তা আসলে আমাদের এই হাতের গুণেই। আর কোনো জানোয়ারের এ-রকম হাত নেই যে-রকম আছে আমাদের। শিম্পাঞ্জীর থাবা বা গরিলার থাবা কিন্তু হাত নয়। তাই দিয়ে বড়জোর একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরা যায়। কিন্তু তাই দিয়ে হাতিয়ার বানানো যায় না। একমাত্র মানুষই হাত দিয়ে হাতিয়ার বানাতে পারে। আর কেউ তা পারে না। হাতের গুণেই হাতিয়ার। আবার হাতিয়ারের গুণেই হাত। আর এই হাত আর হাতিয়ারের গুণেই মানুষ হয়েছে মানুষ। পশু নয় আর।
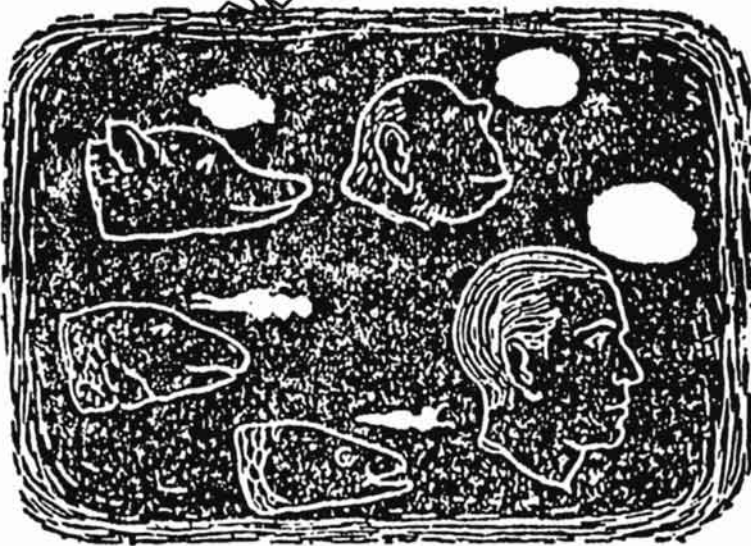
পাঁচ রকম প্রাণীর মগজের ছবি। মানুষের মগজটা কত বড় দেখো!

হাতিয়ার কাকে বলে? যা হাতে নিয়ে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করি তাকে বলে হাতিয়ার। যেমন আমাদের কাস্তে কুড়ুল, তীর ধনুক, কোদাল হাতুড়ি সব কিছুই।

কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করা মানে? আসলে, ওইখানেই তো বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের মস্ত তফাত। বাকি সবাই বেঁচে থাকে পৃথিবীর মুখ চেয়ে পৃথিবীর দয়ার ওপর নির্ভর করে। যদি খাবার জোটে তাহলেই তাদের পেট ভরবে, নইলে নয়। যদি মাথা গোঁজবার জায়গা জোটে তাহলেই মাথা গুঁজতে পারবে, নইলে নয়। মানুষ কিন্তু এ-রকম অসহায়ের মতো, এ-রকম নিরুপায়ের মতো বেঁচে থাকতে রাজি নয়। মানুষ শিখেছে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের দরকার মতো জিনিস জোর করে আদায় করে নিতে। তাই মাটির বুক চিরে ফসল আদায় করা, মাটি পুড়িয়ে আর পাথর কেটে বাড়ি গাঁথতে শেখা। আকাশকে জয় করবার জন্যে মানুষ উড়োজাহাজ বানিয়েছে, পাতালকে জয় করবার জন্যে পরেছে ডুবুরীর পোষাক। আর মানুষ যে পৃথিবীকে এমন করে জয় করতে শিখেছে তার আসল কারণ হলো মানুষের ওই হাতিয়ার।

মাছ থেকে মানুষের বিবর্তন।

কি বুদ্ধি? তুমি হয়তো তর্ক তুলে বলবে, মানুষের এতো-যে কীর্তি তার আসল কারণ হলো মানুষের ওই বুদ্ধি-ই। আর কোনো জানোয়ারের তো মানুষের মতো বুদ্ধি নেই! নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু কেন? শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার কারণ মানুষের ওই হাত, ওই হাতিয়ার। কেননা, বুদ্ধি বলে ব্যাপারটা নির্ভর করে মাথার খুলির মধ্যে মগজ বলে যে জিনিস আছে সেই জিনিসটার ওপর। মানুষের মগজটা অনেক বড়, মানুষের মগজের গড়নটা অনেক ভালো, আর এই জন্যেই তো এতো বুদ্ধি। কিন্তু মগজটা এতো ভালো হলো কী করে? শিম্পাঞ্জীর মগজ আর ওরাঙওটাঙের মগজ তো এতো ভালো হয় নি! তার কারণ, ওই হাত, মানুষের হাত। আসলে শরীরের নিয়মই এই যে, তার মধ্যে কোনো একটা অঙ্গ বাকি

অঙ্গগুলোকে বাদ দিয়ে, শুধু নিজে নিজে, আলাদাভাবে, বদলাতে পারে না। একটা অঙ্গ বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গগুলোও বদলাতে থাকে। তাই বনমানুষদের সেই ফালতু পা দুটোর জায়গায় যতোই মানুষের হাত দেখা যেতে লাগলো ততোই অন্য রকম হয়ে যেতে লাগলো বাকি সব অঙ্গগুলোর সঙ্গে মাথার খুলির মধ্যে মগজ বলে জিনিসটাও। আর তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের চেহারা মানুষের মতো হলো, মানুষের মাথায় এতো বুদ্ধি দেখা দিলো।

পরে বলবো

'ঘুম পাচ্ছে?' এতোক্ষণ পরে আমি রুণুকে জিজ্ঞেস করলাম। 'উঁহু', রুণু বললো, 'বেশ মজার লাগছে। ছিল খুদে খুদে জীব, হয়ে গেল মাছ। ছিল মাছ, হয়ে গেল উভচর। ছিল উভচর, হয়ে গেল সরীসৃপ। ছিল সরীসৃপ, হয়ে গেল স্তন্যপায়ী। আবার, ছিল বনমানুষ, হয়ে গেল মানুষ! এর চেয়ে মজা কি আর কিছু হতে পারে?

'উঁহু'। এর চেয়ে ঢের মজার ব্যাপার আছে। আমার গল্প এই তো সবে শুরু হয়েছে।

'বেশ তো। তাহলে সেই বেশি বেশি মজার মজার ব্যাপারগুলো বলো।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার ঘুম পাচ্ছে।'

'উঁহু। আমার বেশ মজার লাগছে।'

'তাহলে বোধ হয় আমারই ঘুম পাচ্ছে।'

'তাহলে?'

'তাহলে এখন আমি একটু গড়িয়ে নেই। পরে আবার গল্পটা চালাবো।'

'বেশ, তা নাও। কিন্তু পরে ঠিক বলবে তো?'

'নিশ্চয়ই বলবো।' আমি বললাম।

দুপর বেলা খেয়েদেয়ে একটুখানি গড়িয়ে নেবো ভাবছি, এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে আমার ঘরে এলো। আর মেয়েটি সোজাসুজি বললো, 'ভালো চাও তো একটা গল্প বলো, খুড়ো; নইলে দর্জিপাড়া থেকে কাঁচি এনে তোমার গোঁফজোড়া এক্কেবারে সাফ করে দেবো।'

মেয়েটি আমারই ভাইঝি। ওর আসল নাম রুণু, কিন্তু আমি ওকে আদর করে ডাকি চিঙকিপ্রসাদ বলে। নইলে আমার নামের সঙ্গে ওর নামের যে মিল থাকে না! আর এই নামটার জন্যে মেয়েটি আমাকে দারুণ ভালোবাসে। কেননা, ওর মতে রুণু নামটা বড় খটোমটো, করাত দিয়ে কাঠ কাঠবার মতো। চিঙকিপ্রসাদ নামটি বেশ মোলায়েম, সাবানের ফেনার মতো।

আমাকে এতো ভালোবাসে বলেই দুপুর বেলায় গল্প শোনবার জন্যে আমার ঘরে হাজির হয়। আর পাছে আমি গল্প বলতে রাজি না হই এই ভয়ে আমাকে নানান রকম ভয় দেখায়।

আমি অবশ্য জানি দর্জিপাড়ায় সত্যিই গোঁফ কাটবার কাঁচি পাওয়া যায় না। তবু ওকে খুশি করবার জন্যে গল্প বলা শুরু করলাম।

তাহলে? পৃথিবীটা এলো কোথা থেকে? কোথা থেকে এলো মানুষ? সেই কথা দিয়েই গল্পটা শুরু করতে গেলাম। সেই কথাটুকু শেষ করতে করতেই একটা বই শেষ হয়ে গেল। ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিন্তু যার ফরমাসে এই গল্প শুরু করেছিলাম, সে বললো, 'ফ্যাসাদ আবার কোথায়? ওই বইটার মলাটে লিখে দাও প্রথম খণ্ড আর তারপর শুরু করে দাও মানুষের আদত গল্পটা।' আমিও দেখলাম, সেই ভালো। মানুষের আদত গল্পটাই শুরু করছি।

কিন্তু গোড়ার কথাটা ভুললে চলবে না। হাতের গুণেই মানুষ হয়েছে মানুষ। আর কোনো জানোয়ারের হাত নেই। আর হাত নেই বলেই হাতিয়ার বানাতে পারে না, পারে না হাতের মুঠোয় হাতিয়ার ধরতে। আর তাই মেহনত করতে জানে না, জানে না পৃথিবীকে জয় করতে। শুধু মানুষই জানে পৃথিবীকে জয় করতে। তার এই দিগ্বিজয়ের শেষ নেই। শেষ নেই তাই মানুষের গল্পের।

পৃথিবীকে জয় করা

মেহনত। পৃথিবীকে জয় করা। কথাটা শুনতে তো খুবই সোজা লাগে। মেহনতের গুণেই পশুর রাজ্য পেছনে ফেলে এগিয়ে এলো মানুষ। তার মানে কিন্তু পশুরা মেহনত করতে জানে না, একমাত্র মানুষই জানে মেহনত করতে। এইবার হয়তো কথাটা নিয়ে একটু খানি খটকা লাগবে। পশুরা মেহনত করতে জানে না মানে? বলদ যখন ঘানি টানছে, কিংবা গাধা যখন মোট বইছে, তখন কি ওরা মেহনত করছে না? না। খাটছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে মেহনত বলে না। আসলে, কলু খাটাচ্ছে বলদকে, ধোপা গাধাকে দিয়ে মোট বওয়াচ্ছে। কিন্তু তাঁতি যখন তাঁত বুনছে, কামার পিঠছে হাতুড়ি, কিংবা শিকারী যখন ধনুক বেঁকিয়ে

তীর ছুঁড়ছে, তখন একেবারে অন্য রকম কথা। ওরা জানে ওরা কী করছে, ওরা কী চায়; ওরা জানে কেমনভাবে করলে ভালো করে করা যায়। ঘানির বলদ জানে না সে কী চায়, সে যা করছে তা কেন করছে। তাই ঘানিতে ঘোরাটা বলদের পক্ষে মেহনত করা নয়। মেহনতকারী হলো কলু ঃ সে-ই ঘানি বানিয়েছে, বলদ জুড়েছে, ঘানি চালাচ্ছে।

মেহনত মানে নিশ্চয়ই পরিশ্রম। চলতি কথায় যাকে বলে গতর খাটানো। তবু, যে-কোনো রকম গতর খাটানোকেই মেহনত বলা চলে না। একজন পাগল যদি রাস্তায় লাফ-ঝাঁপ করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে যায় তাহলেও তাকে মেহনতকারী বলা হয় না। কেননা, ওই গতর খাটানোটা তার পক্ষে পাগলামি, মেহনত নয়। পশুর দল বনের মধ্যে খাবারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে কি মেহনত বলা হবে? না একেও মেহনত বলা হবে না। কেননা, এ হলো পৃথিবীর মুখ চেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা। মেহনত মানে, মনের মতো করে পৃথিবীকে বদল করা, পৃথিবীকে জয় করা। একটু সাধু ভাষায় বললে বলা যায়, বাঁচবার পরিকল্পনা নিয়ে পরিশ্রম করা।

বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাতটা ওইখানেই। বাকি সবাই বেঁচে থাকে যেন পৃথিবীর দয়ার ওপর নির্ভর করে, পৃথিবীর মুখ চেয়ে। যদি খাবার জোটে তাহলেই পেট ভরবে, নইলে নয়। যদি জোটে মাথা গোঁজবার জায়গা তাহলেই মাথা গুঁজতে পারবে, নইলে নয়। পৃথিবীর সঙ্গে তার লড়াই। সে যেন পণ করেছে লড়াই করে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের দরকার মতো জিনিস আদায় করে নেবে। তাই মাটির বুকে লাঙল দিয়ে সে আদায় করছে ফসল, পাথর কেটে তৈরি করছে পথ, আকাশকে জয় করবার জন্যে বানিয়েছে উড়োজাহাজ, পাতালকে জয় করবার জন্যে পরেছে ডুবুরির পোশাক। রূপকথার সবচাইতে ডাকসাইটে দৈত্যও যা কল্পনা করতে পারতো না আজকের মানুষ তাই করে চলেছে অনায়াসে, যেন খেলার ছলে। পৃথিবীকে জয় করবার এমনই ধুম।

পৃথিবীকে জয় করা। তার মানে কিন্তু বিদেশীর দল যেমনভাবে বাইরে থেকে একটা দেশ জয় করতে আসে তেমনভাবে মোটেই নয়। কেননা, মানুষ তো আর পৃথিবীর বাইরের কেউ নয়। মানুষ পৃথিবীরই একটা অংশ, পৃথিবীরই কতকগুলো জিনিস বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে। বিদেশীরা যখন একটা দেশ জয় করতে আসে তখন নিজেদের আইন-কানুনগুলো জয়-করা দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়। মানুষ কিন্তু পৃথিবীকে জয় করে একেবারে অন্যভাবে ঃ পৃথিবীর যে-সব আইনকানুন সেগুলোকে সবচেয়ে ভালো করে চিনতে শিখে, আর মানতে পেরে—তবেই মানুষ জয় করে পৃথিবীকে। কথাটা শুনতে হয়তো খাপছাড়া লাগবে; পৃথিবীরই আইনকানুন যদি মানা হলো তাহলে আর পৃথিবীকে জয় করা হলো কেমনভাবে? অথচ তাই-ই। পৃথিবীর আইনকানুনকে যতো বেশি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, পৃথিবীর কাছে ততোখানিই হার। পৃথিবীর নিয়মকানুনকে যতো বেশি স্পষ্ট করে চিনতে পারা যায়, মানতে পারা যায়, ততোই এগুলোকে লাগানো যায় নিজের দরকার মতো কাজে; পৃথিবীর ওপর তাই ততোখানিই জিত।

ধরা যাক দুজন মাঝির কথা ঃ একজন হয়তো নদীর স্রোতের নিয়মকানুন জানে না, জানে না বাতাসের নিয়মকানুন। আর একজনের কাছে হয়তো এ-সব ব্যাপার খুব স্পষ্টভাবেই জানা আছে। যে-বেচারা এ-সব জানে না সে তো প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভালো করে নৌকো বাইতে পারবে না। আর, যার কাছে এ-সব ব্যাপার স্পষ্ট জানা আছে, সে

অনায়াসেই নৌকোয় পাল খাটিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাবে —স্রোতের নিয়মকে সে জেনে নিয়েছে, বাতাসের নিয়মকে সে মেনেছে। আর তাই পেরেছে এ-সব নিয়মকে সবচেয়ে ভালো করে নিজের কাজে লাগাতে, নদীকে বশ করতে, জয় করতে পৃথিবীকে।

কিংবা ধরা যাক, উড়োজাহাজে চেপে আকাশকে জয় করবার কথা। আকাশের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, বাতাসে ভর দিয়ে আকাশে ভাসবার নিয়ম, এই সব নিয়মকানুন যখন ভালো করে জানা আর মানা গেল তখনই মানুষ পারলো উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশে পাড়ি দিতে। তার আগে নয়। কিন্তু কেউ যদি বলতো, ও-সব নিয়মকানুন আমি জানি না, জানতে চাই না, তাহলে সে কি কখনো পারতো আকাশে পাড়ি দিতে, আকাশকে জয় করতে?

তাই, পৃথিবীকে জয় করবার জন্যে দরকার হলো পৃথিবীকে চিনতে পারা, জানতে পারা। কিন্তু এখানে একটা ভারি মজার কথা আছে। মানুষ যদি হাত গুটিয়ে চুপটি করে পৃথিবীর কথা শুধু ভাবে, —ভাবতে ভাবতে মাথার চুল একেবারে পাকিয়ে ফেলে —তাহলেও তার পক্ষে পৃথিবীকে চিনতে পারা যায় না; তার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলাও দরকার, দরকার পৃথিবীকে জয় করবার চেষ্টাও। অর্থাৎ কি-না, মেহনত। চিনতে না পারলে জয় করবার উপায় নেই, আবার জয় করবার চেষ্টা না করলে উপায় নেই চিনতে পারবার। এ এক ভারি মজার ব্যাপার, নয় কি? মানুষ যতো বেশি করে পৃথিবীকে জয় করে চলেছে ততোই ভালো করে চিনতে শিখছে পৃথিবীকে; আবার মানুষ যতো ভালো করে চিনতে শিখছে পৃথিবীকে, ততোই বেশি করে পারছে তাকে জয় করতে। —

বন্য থেকে সভ্য

হাতিয়ার হাতে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের লড়াই। মানুষের হাতিয়ার যতো ভালো হয়েছে মানুষ ততোই ভালো করে পৃথিবীকে চিনতে আর জয় করতে শিখেছে। তাই হাতিয়ারের উন্নতি মানুষকে কোথা থেকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেলো তারই একটা হিসেব দেখা যাক।

মানুষ যখন সবেমাত্র পশুর রাজ্য পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে তখনই কিন্তু তার সঙ্গে পশুর তফাত তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তখনো বনেজঙ্গলেই মানুষের বাস, বনজঙ্গল থেকে ফলমূল জোগাড় করেই পেট ভরাবার চেষ্টা। কেননা, মানুষের হাতিয়ার তখনো এমনই ভোঁতা আর বাজে যে তাই দিয়ে ফলমূল জোগাড় করবার চেয়ে বড়ো একটা বেশি কাজ করা যায় না। মানুষের এই অবস্থাটাকে বলা হয় বন্য অবস্থার সব-নিচু দশা। আর এই দশায় মানুষের যেটা সবচেয়ে বড়ো আবিস্কার সেটা হলো তার কথা বলবার ভাষা।

এইখানে কিন্তু গল্পটা বেশ একটু জটিল। সবটা খুঁটিয়ে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হবে। কিন্তু সাঁটে বলবো, নইলে তোমার ঘুম পেয়ে যাবে।

মানুষের পূর্বপুরুষদের শরীরের গড়ন বদলাতে বদলাতে যখন থেকে এক জোড়া হাত দেখা যাচ্ছে তখন থেকে-আর তারই ফলে—মানুষের শরীরে আরো রকমারি অদল বদল শুরু হয়েছে। যেমন ধরো, যতোদিন হাত বলে কিছু নেই ততোদিন অনেক কাজ করতে হয় মুখের চোয়াল দিয়ে; গাছের ফলমূল ছেঁড়া থেকে রকমারি কাজ। কিন্তু হাতের কাজ শুরু হবার সময় থেকে চোয়াল জোড়ার দায় ঢের কমলো। তুলনায় অকেজো হবার ফলে চোয়াল জোড়ার মাপও সিঁটিয়ে আসতে লাগলো। তাই মাথার খুলির মধ্যে মগজ বলে যে-জিনিসটি

আছে —যার উপর নির্ভর করেই মানুষের সব রকম ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষমতা —সেই মগজটি যাতে বাড়তে পারে তার জন্যে খুলির মধ্যে জায়গা তৈরি হলো। বাড়লো মানুষের মগজ; হাতের কাজের রকমারি দায়দায়িত্ব চোকাবার জন্যে নতুন ধরনের ভাবনা-চিন্তার তাগিদ মেটাবার পক্ষে ওই সুবিধাজনক মগজের গড়নটাও আরো জটিল আর উন্নত হতে লাগলো। মানুষের পূর্বপুরুষ বনমানুষেরা যা ভাবতে পারতো না, মানুষ তা ভাবতে শিখলো; তার মাথায় নতুন নতুন ধারণা আসতে শুরু করলো। ফলে কিন্তু হাতের কাজটাও উন্নত হতে লাগলো ঃ নতুন করে ভাবতে শিখে নতুন ধরনের কাজ করবার ধারণা নিয়ে মানুষ নুতন রকমের কাজকর্ম করতে শুরু করলো। সোজা কথায়, মগজের উন্নতির ফলে হাতের —আর হাতের কাজেরও —উন্নতি হতে লাগলো।

হাতের উন্নতির সঙ্গে চিন্তাশক্তির উন্নতি —দুটোকে তাই আলাদা করা যায় না।

কিন্তু মানুষের মুখে ভাষা ফুটলো কী করে? ভাষা বলতে অবশ্যই গলার স্বর; শরীরের যে-অংশর উপর নির্ভর করে জন্তু জানোয়ার থেকে মানুষ পর্যন্ত গলার যে-স্বর বের করতে পারে তাকে বলে স্বরযন্ত্র। ইংরেজীতে যাকে বলে ল্যারিঙস। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, বেড়াল মিউ মিউ করে, পাখির গলার স্বর আমাদের কাছে অনেক সময়ই সুরেলা লাগে। এদের সকলের শরীরেই স্বরযন্ত্র আছে। মানুষের তুলনায় তা খুব একটা বাজে ধরনের নয়। তারাও গলা দিয়ে রকমারি আওয়াজ বের করে।

কিন্তু এরা কেউ কথা বলতে পারে না। তার মানে এদের কারুর মুখেই ভাষা ফোটে নি। শুধু মানুষের মুখে ভাষা ফুটেছে; শুধু মানুষই কথা বলতে পারে।

তাহলে ব্যাপারটা আসলে কী? স্বরযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো জীবজন্তু কেন কথা বলতে পারে না? স্বরযন্ত্র ব্যবহার করেই মানুষ কিন্তু কথা বলতে পারে। তফাতটা কেন?

কেননা, ভাষা বলতে শুধু গলার শব্দ বের করা নয়। মানুষের ভাষা শব্দ দিয়ে তৈরি; কিন্তু শব্দগুলোর মানে আছে। শব্দগুলোকে তাই বলে ধারণার বাহক। আমি একটা কথা বললাম; তুমি শুনলে আর শুনে বুঝতে পারলে আমি ঠিক কী বলতে চাই। তার মানে, আমার কথাটা তোমার কাছে আমার ধারণাটা পৌঁছে দিলো। তাহলে মগজের উন্নতির ফলে ধারণা বলে ব্যাপারটা সৃষ্টি না-হওয়া পর্যন্ত গলার স্বর নেহাতই অর্থহীন হয়ে থাকে। কিন্তু মগজের উন্নতির ফলে মানুষের মাথায় ধারণা সৃষ্টি হলো। একের ধারণা বাকি দশের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে মানুষের গলার স্বর আর নেহাতই অর্থহীন চীৎকার হয়ে রইলো না। ধারণার বাহক হয়ে গেলো। মগজের উন্নতি না হলে পুরো ঘটনাটাই ঘটতে পারতো না।

এদিকে কিন্তু মানুষের মুখে ভাষা ফোটবার ফলে তার হাতের কাজও আরো উন্নত হতে লাগলো। কেননা, একের ধারণা বাকি দশের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে দশে মিলে কাজটা করা অনেক সহজ হয়। এদিক থেকে ভাবলে বুঝতে পারা যায়, মুখের ভাষার সঙ্গে—কথা বলতে শেখবার সঙ্গে আবার সেই মেহনতেরই সম্পর্ক, হাতের কাজের সম্পর্ক। দল বেঁধে কাজ করতে গেলে ভাষার—কথা বলার—সম্পর্ক যে কতো কাছাকাছি তা তো হামেশাই দেখা যাচ্ছে। কোন্ দিকে বিপদ, কোন্ দিকে খাবারের যোগান—এই সব ব্যাপার একজনের পক্ষে দলের বাকি দশজনকে অনেক সহজে মানুষ বোঝাতে পারে। কেননা, তার মুখে কথা ফুটেছে।

অবশ্য এই সব ব্যাপার নিয়ে আরো অনেক আলোচনা বাকি আছে। গলা দিয়ে কোন্ শব্দ বের করলে মানুষের ভাষা হিসেবে তা কোন্ ধারণার বাহক হবে তা নির্ভর করছে মানুষের দলের উপর। তাই এদেশে একটা শব্দের মানে এক, অপর দেশে সেই শব্দরই মানে আলাদা। 'গান' বলতে আমরা যা বুঝি, ইংরেজরা তা বোঝে না। আর তাই শিশুকে ভাষা শেখাতে হয়; জন্ম থেকেই তো তার মুখে কথা ফোটে না। মা-বাবার কাছ থেকে তাকে ধীরে ধীরে ভাষা শিখতে হয়। তার মানে, তাকে শেখাতে হয়, নিজেদের দলের অপর দশজনের কাছে অমুখ-ধরনের গলার স্বর মানে অমুখ; তমুখ ধরনের গলার স্বর মানে তমুখ।

আমি যে গল্প শুরু করেছি আর তা শুনতে শুনতে তোমার কাছে গল্পটা যে বেশ জমে উঠছে তার কারণ তোমার আর আমার ভাষা একই। গল্প বলতে বলতে আমার গলা শুকিয়ে এলে তোমায় যদি এক গেলাস জল এনে দিতে বলি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তা এনে দেবে। পশুর জগতে এমন ব্যাপার সম্ভবই নয়।

কথাগুলো মনে রেখে আমাদের আসল গল্পটায় ফেরা যাক।

পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মানুষ দুটো দারুণ জরুরী জিনিস আবিস্কার করে ফেললো। এক হলো পাথরের হাতিয়ার, আর এক হলো আগুন। ধারালো আর ছুঁচোলো পাথরের টুকরোগুলো হাতিয়ার হিসেবে চমৎকার। তাই দিয়ে মাটি খোঁড়া যায়, শিকার করা যায়, এমনি কতো কি। আবার একরকম পাথরে পাথরে ঠোকা দিলে ঠিকরে বেরোয় আগুনের ফুলকি, সে-ফুলকি শুকনো পাতায় পড়লে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। মানুষ আবিস্কার করলো আগুন। সেই আগুনে মাছ ঝলসে খাওয়া, শিকার ঝলসে খাওয়া, খাওয়া-দাওয়ায় কতোই না উন্নতি!

ইতিমধ্যে শিকার জোগাড় করবার জন্যে মানুষ বর্ষা আর মুগুর তৈরি করতে শিখেছে। এতো সব আবিষ্কারের দরুন মানুষ অনেকখানি স্বাধীন হয়ে উঠলো। খাবারের আশায়, শীতের হাত থেকে বাঁচবার আশায়, জঙ্গলের একটা জায়গায় আর কুঁকড়ে পড়ে থাকবার দরকার নেই। তাই মানুষ শুরু করলো ঘুরে বেড়াতে ঃ নদীর কিনারা ধরে ধরে এ-জঙ্গল পেরিয়ে ও-জঙ্গল, এ-দেশ পেরিয়ে ও-দেশ। অনেক হাজার বছর ধরে যাযাবর মানুষের দল পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে, ওদের পাথরের তৈরি হাতিয়ার সে-সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়। সে-সব হাতিয়ার আজও আমাদের চোখে পড়ে, বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলির খোঁজ পেলে যত্ন করে জাদুঘরে জমিয়ে রাখেন। মানুষের এই যে-অবস্থা, এর নাম দেওয়া হয় বন্য অবস্থার মাঝামাঝি দশা।

তারপর মানুষ আবিস্কার করলো তীর-ধনুক। তীর-ধনুকই বন্য অবস্থার সবচেয়ে চূড়ান্ত হাতিয়ার। তাই তীর-ধনুক হাতে পেয়ে মানুষ উঠে এলো বন্য অবস্থার সব-ওপর স্তরে। তীর-ধনুক পেয়ে শিকার জোগাড় করা কতখানি সহজ হলো তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারো ঃ খাবার জোগাড় করবার সমস্যা অনেকখানিই চুকে গেলো, মানুষ যেন থিতিয়ে বসবার অবসর পেলো। দেখা গেলো, মানুষ গ্রাম গড়বার চেষ্টা করছে। অবশ্য তখনকার দিনের গ্রাম আজকালকার গ্রামের চেয়ে ঢের ঢের বাজে ব্যাপার। ইতিমধ্যে পাথরের হাতিয়ারগুলো অনেক ধারালো, অনেক ভালো হয়ে উঠেছে, তাই দিয়ে মানুষ নানান রকম

কাঠের জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছে —কাঠের ডিঙি, কাঠ কুরে কুরে কাঠের বাটি বা ঘট, এই রকম অনেক কিছু।

তারপর মানুষ শিখলো মাটির ঘট বানাতে আর তখন থেকেই বন্য দশাকে পেছনে ফেলে সভ্যতার স্তরে উঠে আসা। আর তারপর দুটো দারুণ আবিস্কার ঃ পশুপালন আর চাষবাস। পশুপালন ঃ শিকারের আশায় আর হন্যের মতো বনে বনে ঘুরতে হবে না, তার বদলে বনের জানোয়ারকে পোষ মানিয়ে ঘরে বেঁধে রাখা। এই সব জানোয়ারের কাছ থেকে দুধ পাওয়া যাবে, মাংস পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে চামড়া। পালন-করা পশু বলতে বেশির ভাগই গরু আর ভেড়া। আর চাষবাস বলতে আজকালকার মতো ক্ষেতে লাঙল দিয়ে ফসল ফলানো বোঝায় না। তবু ফসল ফলানো, মাটির বুকে খাবার ফলানোর কাজটা নিজের কবলে, তাই ফলমূলের আশায় আর বনে বনে ঘোরা নয়।

পশুপালন আর চাষবাস। প্রথম দিকে পাথরের খোন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে বীজ পোতা; ক্রমশ লাঙ্গল দিয়ে চাষ। সবচেয়ে আদিম ধরনের লাঙল অবশ্য কাঠের তৈরি। কিন্তু মানুষ ক্রমশ শিখলো লোহা গলাতে; লোহা গলিয়ে লোহার হাতিয়ার তৈরি করতে। তৈরি হলো লোহার লাঙল।

কোথা থেকে শুরু করে মানুষ কোন্‌খানে এসে পৌছলো? হন্যের মতো বনে বনে ঘোরা, ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে কোনোমতে ফলমূল জোগাড় করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা। ওইখান থেকে শুরু করেছিলো মানুষ। আর লোহা গলাতে শেখবার পর? তখন থেকে, মানুষের পোষা জানোয়ার মানুষের ক্ষেতে মানুষের তৈরি লোহার লাঙল টানছে। ফসল, অনেক অনেক ফসল। নিছক বেঁচে থাকবার জন্যে যতোখানি দরকার তার চেয়েও বেশি জিনিস পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করতে পারা। বাড়তি জিনিস তৈরি করতে পারা, যে-জিনিসটাকে ঘরে জমিয়ে রাখা যায়। বেঁচে থাকবার সমস্যা অনেকখানি সহজ হলো, মানুষ মন দিতে পারলো আরো নানান রকম কাজে। মুখের ভাষাকে লেখার হরফ দিয়ে প্রকাশ করতে পারা। মানুষ আবিস্কার করলো লেখার হরফ। আর এই লেখার হরফ আবিস্কার হবার সময় থেকে মানুষ রীতিমতো সভ্য হয়ে উঠলো। তার মানে অসভ্য অবস্থাকে পেছনে ফেলে সভ্যতার আওতায় উঠে আসা!

সভ্যতার কথায় পরে আসছি। সভ্যতা শুরু হবার আগে পর্যন্ত মানুষের যে কী অবস্থা তা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

মানুষ যখন ছেলেমানুষ ছিলো

পশুপালন আর চাষবাস। এই দুটো কাজ শিখতে পারবার পর থেকে মানুষ যেন রীতিমতো সাবালক হয়ে উঠলো। তার আগে পর্যন্ত মানুষ নেহাতই ছেলেমানুষ বুঝি!

মানুষ যতোদিন ছেলোমানুষ ছিলো ততোদিন বেচারার অবস্থা নেহাতই খারাপ। নেহাতই গরিব যেন। গরিব না হয়ে উপায়ই-বা কি? আজকালকার মতো বাড়ি-গাড়ি তো দূরের কথা, দুবেলা পেট ভরাবার মতো খাবার জোগাড় করাই তখন দারুণ কঠিন কথা। শুধু ওই খাবার জোগাড় করবার চেষ্টাতেই তাকে তার সবটুকু শক্তি খরচ করতে হয়।

মানুষের যখন এইরকম দীনদরিদ্র অবস্থা তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বড়োলোক গরিবলোকের তফাত দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। বড়োলোক হয়ে বড়োলোকি করবার মতো অতো জিনিসপত্তর কে পাবে? কোথা থেকে পাবে? সামান্য সম্বল নিয়ে তখন কোনোমতে বেঁচে থাকা। আর তাই একসঙ্গে দল বেঁধে বেঁচে থাকা। বড়োলোক নেই, গরিবলোক নেই; রাজা নেই, প্রজা নেই; মালিক নেই, মজুর নেই। সারাটা দল সারা দিনের চেষ্টায় মোট যেটুকু খাবার জোগাড় করতে পারে তার ওপর দলের সবাইকার সমান অধিকার —কেউ বেশি পাবে, কেউ কম পাবে, এমন ব্যবস্থা মোটেই নয়।

সমানে-সমান হয়ে বেঁচে থাকা। তবু মনে রাখতে হবে এই যে সমানে-সমান ভাব এর আসল কারণ হলো অভাব, দৈন্য। সকলেই গরিব আর তাই সকলেই সমান। নিজস্ব জিনিস বলতে, নিজস্ব সম্পত্তি বলতে, কারুর কিছু নেই। সম্পত্তি বলতে কী আর হতে পারে? শিকার করবার জমিজঙ্গলের ওপর তো কারুর একার দখল নয়; পুরো দল শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে, জমিজঙ্গলগুলোর ওপর পুরো দলের সমান অধিকার। নিজের বলতে তখন শুধু ওই হাতিয়ারগুলো। কিন্তু ওগুলোও তখন এমন ধরনের যে তৈরি করতে পারা খুব সোজা। তীরধনুক, পাথরের মুগুর, পাথরের বল্লম। যে কেউ খুশিমতো তৈরি করে নিতে পারে, আর তাই এগুলোর মালিকানা নিয়ে মারপিট বাধবার কথা নয়।

বুঝতেই পারছো, মানুষের যখন এই অবস্থা তখন টাকা-কড়ি বা ধনরত্ন বলে কোনো জিনিস থাকতেই পারে না। পৃথিবীর কাছ থেকে তখন মানুষ সবশুদ্ধ যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তার সবটুকুই তো খরচ হয়ে যায় কোনোমতে বেঁচে থাকবার জন্যে। ফালতু কিছু পড়ে থাকেনা, বাড়তি বলে কিছু নেই। তাই কেনাবেচা করবার কোন কথা ওঠে না, কথা ওঠে না টাকাপয়সা বা ধনরত্ন জমাবার।

দলের সবাইকেই তখন প্রাণপণ মেহনত করতে হয়। ফাঁকি মারবার যো নেই, আলসেমি করবার যো নেই। কুঁড়েমি করবে কে? যে কুঁড়েমি করবে সে খাবে কী? যদি এমন হয় যে অন্য কেউ গতর খাটিয়ে খাবার জিনিস জোগাড় করে দিচ্ছে তাহলেই তো কারুর পক্ষে পায়ের ওপর পা দিয়ে হাই তোলা সম্ভব। কিন্তু তখনকার অবস্থায় এ-কথা একেবারেই ওঠে না। হাতিয়ারগুলো নেহাতই বাজে ধরনের, আর সেই হাতিয়ার হাতে একজন মানুষ প্রাণপণ মেহনত করে পৃথিবীর কাছ থেকে যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তার সবটুকুই তো খরচা হয়ে যায় কোনোমতে তার নিজের প্রাণ বাঁচাবার কাজে। তাই সকলকেই মেহনত করতে হয়, মেহনতের দিক থেকে সকলেই সমানে সমান। তাই বলে সবাই যে ঠিক একই ধরনের কাজ করছে তা অবশ্য বলা যায় না। পুরো দলটার পক্ষে বেঁচে থাকবার জন্যে যতোখানি মেহনত দরকার সে-মেহনত নিয়ে বহুদিন আগে থাকতেই একটা মোটামুটি ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মেহনতের ভাগাভাগি করতে শিখলেও তখনকার মানুষ এ নিয়ে কোনো ইজ্জতের তফাত করতে শেখে নি।

কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে। আজকের দিনে কী রকম? ও-লোকটা নেহাতই চাষাভূষো, এ-লোকটা নেহাতই কুলি-মজুর-তার মানে এরা সব ছোটোলোক। অমুকবাবু আপিস করেন, ভদ্রলোক। তমুকবাবু মাস্টারি করেন, খাতির করবার মতো লোক। অবশ্য আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি খাতির হলো তাঁর যিনি নিজে বড়ো একটা গতর খাটান না।

যেমন ধরো, বড় কারখানার মালিক কিংবা গ্রামের জোতদার। এঁদের কথা না হয় ছেড়েই দাও। যারা সত্যিই মেহনত করে তাদের কথাই ধরো। এক একজন এক এক রকম মেহনত করে আর এই রকমারি মেহনতের দরুন রকমারি মানুষের রকমারি খাতির। মোটের ওপর, যারা গতর খাটায় তাদের চেয়ে যারা মাথা খাটায় তাদের কদর বেশি। গতর খাটানোটা নেহাতই যে ছোটোলোকমি। কিন্তু মানুষেরা যখন সমানে-সমান তখন একেবারে অন্যরকম। কেউই গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরতে পারে না, গতর না খাটালে কারুর পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়। তাই, মেহনত করাটা যে মন্দ কাজ এ-কথা তখন কারুর মাথায় আসবে কেমন করে? দলের মধ্যে অবশ্য নানান মানুষের নানান রকম কাজ : কেউ বা শিকার খুঁজতে বেরুচ্ছে, কেউ বেরুচ্ছে মাছ ধরতে, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করছে কেউ হয়তো বা। আবার মেয়েরা হয়তো কচি ছেলেপুলে সামলাচ্ছে, জানোয়ারের ছাল থেকে পরনের জিনিস তৈরি করছে, এই রকম নানান রকম। কিন্তু এতো রকমের মধ্যে এটা ভালো ওটা মন্দ, এটা খাতির করবার মতো ওটা ঘেন্না করবার মতো —তা মোটেই নয়।

মানুষ যতোদিন সমানে-সমান হয়ে বাঁচতো ততোদিন পর্যন্ত কারুর পক্ষেই অপরের জিনিস কেড়ে নেবার কথা ওঠে না। তার মানে, তখনো, মানুষ লুটপাট করবার মহিমাটা শেখে নি। কে লুটপাট করবে? কী লুটপাট করবে? দলের সবাই মিলে মেহনত করে সবশুদ্ধ যতোখানি জিনিস জোগাড় করতে পারলো তার সবটুকুই তো খরচা হয়ে যায় কোনোমতে দলের সবাইকার জান বাঁচাবার জন্যে। জমাবার মতো ফালতু জিনিস কারুর কাছেই নেই, তাই একজনের পক্ষে আর একজনের জিনিসের ওপর লোভ করবার কথা ওঠে না।

কিন্তু এই অবস্থা ক্রমশ বদলাতে লাগলো। হাতিয়ারের উন্নতির ফলে মানুষ নিছক বেঁচে থাকবার চেয়ে বেশি উপকরণ তৈরি করতে শিখছে। বাড়তি উপকরণটা জমছে মানুষের ঘরে। প্রথম দিকে অবশ্য এই বাড়তি উপকরণটা দিয়ে দলেরই কয়েকজনকে দক্ষ কারিগর হবার সুযোগ করে দেওয়া গেলো। নিজেদের পেট ভরাবার জন্যে সেই কারিগরেরা আর খাবার জোগাড়ের কাজে আটকে থাকবে না; পুরো সময়টাই কারিগরিতে দিতে পারবে —বাকি সকলের তৈরি বাড়তি জিনিস দিয়ে তাদের পেট চলবে। এইভাবে পুরো সময়টা কারিগরিতে লাগাতে পারলে হাতিয়ারের ঢের ঢের উন্নতি হওয়া সম্ভব। আবার হাতিয়ারের এই উন্নতির ফলে জিনিসপত্র তৈরির কাজও অনেক উন্নত হতে লাগলো; ঢের ঢের বেড়ে যেতে লাগলো। ফলে বাড়তে লাগলো জমানো সম্পদ।

এইখান থেকে কিন্তু মানুষের গল্পে একটা দারুণ মোড় ফিরতে শুরু হলো। দশজনের জমানো সম্পদ একজন যদি কোনোমতে আত্মসাৎ করতে পারে তাহলে তো সে বাকি সকলের চেয়ে ঢের বেশি নিজের ঘরে তুলতে পারবে। ফলে সে আর বাকিদের সঙ্গে সমান থাকবে না; তুলনায় বড়োলোক হয়ে যাবে। আর হলোও তাই। গায়ের জোরে বা ছলে-বলে-কৌশলে দলেরই কিছু লোক বাকিদের বাড়তি সম্পদটা কেড়ে নেবার আয়োজন শুরু করলো। ফলে ভাঙন ধরলো সমাজে। এখন থেকে দলের সকলে আর সমানে সমান নয়; কারুর ঘরে ঢের বেশি, কারুর ঘরে ঢের কম।

কিন্তু ব্যাপারটা একটু পর আর একটু ফলাও করে বলবো। মিলেমিশে সমানে-সমান হয়ে থাকবার অবস্থা যখন থেকে শেষ হয়েছে তারপর থেকেই মানুষের মনে জন্মেছে লোভ, মানুষের সামনে খুলেছে পরের জিনিস লুটপাট করে সহজে সুখভোগ করবার পথ। তখন থেকেই মানুষের শত্রু হয়েছে মানুষ। তার আগে নয়। তার আগে পর্যন্ত মানুষের সামনে শুধু একটা পথ, মেহনত করবার পথ, পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করবার পথ —মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই নয়।

তর্ক করে কেউ হয়তো বলবে, লুটতরাজের মতলব যদি না-ই ছিলো তাহলে তখনকার দিনের মানুষ লড়াই করতে যেতো কেন? উত্তরে বলবো, লড়াই ওরা মাঝে মাঝে করতো, কিন্তু লুটতরাজের মতলবে নয়, নেহাতই জানের দায়ে। জানের দায়ে লড়াই করা মানে? কথাটা বুঝিয়ে বলছি। ধরো, এখানে একদল মানুষ রয়েছে, তাদের দলে হাজার দুয়েক লোক। শ-খানেক মাইল দূরে আর একদল মানুষ, তাদের দলেও ধরো হাজার দুয়েক লোক। মাঝখানের যে একশো মাইল জমি-জঙ্গল তার খানিকটা জায়গা জুড়ে শিকার-টিকার খোঁজে প্রথম দলের মানুষ, খানিকটা জায়গা জুড়ে শিকার-টিকার খোঁজে দ্বিতীয় দলের মানুষ। জমির মালিক বলতে সত্যি কেউ নয়, খানিকটা করে জায়গা জুড়ে শিকার খোঁজ করবার অভ্যেস এক একটা দলের। এ-অবস্থায় দলের লোক বাড়তে বাড়তে হয়তো প্রথম দলটায় তিন হাজার মানুষ হয়ে গেলো। তখন তারা যদি আরো খানিকটা বেশি জায়গা জুড়ে খাবার জোগাড় করবার চেষ্টা না করে, তাহলে তারা বাঁচবে কেমন করে? আর এইভাবে, বাড়তি জায়গা থেকে খাবার জোগাড় করবার চেষ্টা করলে অন্য দলের মানুষদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবার খুব বেশি সম্ভাবনা। তাই লড়াই। ও-সব লড়াই নেহাতই জানের দায়ে লড়াই, কোনো একজনের পক্ষে দলেরই বাকি কজনের জমানো জিনিস কাড়বার তাগিদে নয়। অপরের জমানো ধনরত্ন লুট করে আনবার লোভে যুদ্ধ নয়। পরের যুগে যে-সব যুদ্ধ সেগুলো কিন্তু জানের দায়ে মোটেই নয়, আসলে সেগুলো হলো মেহনত করবার বদলে লুটপাঠ করে সহজে বড়োলোক হবার মতলবে যুদ্ধ।

মানুষ যতোদিন ছেলেমানুষ ছিলো ততোদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শাসনব্যবস্থা বলে কোনো কিছুর দরকার পড়ে নি। রাজা নেই, উজির নেই; পাইক নেই, পেয়াদা নেই; সরকার নেই, চাকুরে নেই; হাকিম নেই, উকিল নেই; কয়েদ নেই, কয়েদী নেই। তখন কেউ কাউকে শাসন করে না। দলের মধ্যে যদি কারুর সঙ্গে আর কারুর ঝগড়া-ঝাঁটি হয় তাহলে দলের সবাই মিলে একটা নিস্পত্তি করে দেবে। মানুষের জীবন তখন এমন সহজ আর এমন স্বাভাবিক যে আইন কাকে বলে, উচিত-অনুচিত মানে কী, এ-সব কথা নিয়ে কারুর পক্ষেই মাথা ঘামাবার কথা ওঠে না। আসলে আইন বলো, উচিত বলো, আদালত বলো —সব কিছুর পেছনে রয়েছে একটা ব্যাপার ঃ সেটা হলো মানুষের দল দুটো দলে ভেঙে যাবার ব্যাপার —একটা দল আর একটা দলকে শাসনে রাখবে, এই রকমের দুটো দল। এইভাবে শাসনে রাখতে পারলে অপরের সম্পদটুকু আত্মসাৎ করা সহজ হয়ে যায়। মানুষ যতোদিন ছেলেমানুষ ছিলো ততোদিন পর্যন্ত এ-রকম দুটো দলের কথাই ওঠে না। তাই শাসন নেই, আইন নেই, উচিত-অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামাবার বালাই নেই।

তাহলে দলের কাজটা চলতো কেমন করে? সকলেরই না হয় সমানে-সমান, তবু সর্দার বলে একজন কাউকে মেনে না নিলে দল তো আর চলে না। তাই রাজা-রাজড়া থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত সর্দারের সর্দারিটুকু তো ছিলো!

দলের গড়নটা কী করম ছিলো তাই বলি। শুনলে বুঝতে পারবে শাসকের দাপট বাদ দিয়েও মানুষের সমাজ কতো শান্ত আর সরল-ভাবে চলতে পারে। তখন পুরো দলটাকে চালাবার ভার দলের সর্দার আর মোড়লের ওপর —সর্দার চালায় লড়াইয়ের কাজ, মোড়ল বাকি সব কাজ। কিন্তু এই মোড়ল বা সর্দার রাজা-উজির ধরনের কিছু নয়। কেননা, সবাই একসঙ্গে বসে ঠিক করে দেয়, কে হবে মোড়ল, কে হবে সর্দার। নিজেদের মধ্যে থেকেই তারা কাউকে মোড়ল বলে ঠিক করলো, কাউকে সর্দার বলে বেছে নিলো। তারপর, এই বাছাই হবার পর দলের লোক যদি কোনোদিন মনে করে ওই মোড়ল বা সর্দার দলের কাজ ঠিকমতো চালাতে পারছে না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাতিল করে দেওয়া, অন্য কাউকে মোড়ল বা সর্দার হিসেবে নতুন করে বেছে নেওয়া। তাছাড়া, রাজা মরলে রাজার ছেলে রাজা হবার কথা। মোড়ল আর সর্দারের বেলায় মোটেই তা নয়। মোড়ল মরে গেলে দলের মধ্যে থেকে নতুন করে কাউকে সর্দার বলে ঠিক করা হবে। আরো একটা মস্ত বড়ো তফাতের দিক আছে। রাজা নিজে গতর খাটায় না, বাকি সবাই মেহনত করে রাজাকে খাওয়ায়, রাজা বসে বসে আয়েস করে, মজা মারে। মোড়ল আর সর্দারকে কিন্তু মেহনত করতে হয় বাকি সবাইকার মতোই। বরং, বাকি সবাইকার চেয়ে ওদের দায়িত্ব অনেক বেশি, কিন্তু তাই বলে ওদের ভাগে বেশি জিনিস পড়বার, বা ওদের পক্ষে বেশি সুখ ভোগ করবার কোনো কথাই ওঠে না।

ওরা জানতো মেহনত করতে আর ওরা ভালবাসতো . . .

ওরা কী ভালোবাসতো দল বেঁধে একসঙ্গে তালে তালে নাচতে।

আর, ওরা ভালোবাসতো ছবি আঁকতে।

কী আশ্চর্য আর সুন্দর ছবিই না ওরা আঁকতে পারতো! ওদের যে-সব আস্তানা আজ আবিস্কার হয়েছে সে-সব আস্তানার দেয়াল থেকে আজো ওদের আঁকা ছবি মুছে যায় নি। অপূর্ব সুন্দর ছবি, সেগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে আজকের মানুষও একেবারে অবাক হয়ে যায়।

তা হোক।

মানুষের যতোদিন ওই রকমের আদিম অবস্থা ততোদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা ভারি সুন্দর, ভারি সরল। কিন্তু এই সঙ্গেই যদি আরো একটি কথা স্পষ্টভাবে মনে না রাখো তাহলে মানুষের গল্পটা বোঝবার সময় একেবারে গোড়ায় গলদ থেকে যাবে। কথাটা হলো, মানুষের অবস্থা তখন বড়ো করুণ। সে যে কী অসহ্য, দৈন্য, কী অমানুষিক অভাব —আজকের দিনে তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করতে পারাও কঠিন। আর তা তো হবার কথাও। কেননা, মানুষের হাতিয়ারটা তখন নেহাতই যে বাজে ধরনের —ওই হাতিয়ার হাতে পৃথিবীর সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করেও মানুষ নিজের জন্যে যেটুকু জিনিস আদায় করতে পারে তা যে নেহাতই তুচ্ছ, নেহাতই সামান্য। তার মানে, ওই সহজসমান সম্পর্কের উল্টো পিঠেই দারুণ হাহাকারের কথা। এই হাহাকারের কথাটা বাদ দিয়ে আদিম মানুষের গল্পটা বোঝা চলবে না। আর তাই, একটু পরেই আরো ভালো করে দেখতে পাবে,

ওই আদিম অবস্থাটিকে পেছনে ফেলে আসবার সময় মানুষ একদিকে যেমন সমানে-সমান সম্পর্কের আনন্দটুকু হারালো তেমনিই অন্য দিকে খুঁজে পেলো হাহাকারের হাত থেকে নিস্তার পাবার পথ।

আপাতত সমানে-সমান ভাবে বাঁচবার কথাটা আরো একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক।

নাচ, ছবি আর ইন্দ্রজাল

নাচ, গান, ছবি —আজকের পৃথিবীতেও এ-সবের অভাব নেই। তবু আদিম মানুষদের সঙ্গে অনেক তফাত। কেননা আজকের দিনে এ-সব হলো নেহাতই শুধু আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। কাজকর্মের সঙ্গে, মেহনতের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক নেই। বরং কাজকর্ম চুকে গেলেই এ-সব নিয়ে একটু আধটু, যাকে বলে, অবসর-বিনোদন। কিন্তু আদিম মানুষের বেলায় মোটেই তা নয়, শুধু বিনোদন করবার মতো অবসর ওদের কোথায়? ওদের হাতিয়ার যে নেহাতই বাজে ধরনের, সেই হাতিয়ার হাতে কোনোমতে পেট ভরাবার মতো খাবার জোগাড় করতেই যে ওদের সমস্ত দিন, সমস্ত সময়, কেটে যায়। তাই, শুধু আমোদ-প্রমোদ করবার কথা ওদের বেলায় ওঠেই না।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলার এক পাহাড়ের গুহায় আঁকা আদিম মানুষের গন্ডার শিকারের ছবি।

তাহলে? ওরা নাচতো কেন, গাইতো কেন, কেন আঁকতো ছবি? শুনতে তোমার খুবই অবাক লাগবে, কিন্তু আসল কথা হলো ওদের কাছে এ-সব ছিলো মেহনত করবার, পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করবার, এক একটা কায়দা-কানুনই। কিন্তু নেচে, গেয়ে বা ছবি এঁকে পৃথিবীকে জয় করা যাবে কেমন করে? কথাটা ভালো করে বুঝতে হলে আগে দেখতে হবে ওদের নাচ, গান আর ছবি আঁকার মূলে যে ব্যাপারটা ছিলো সেটার দিকে। সে-ব্যাপারটার নাম হলো ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল মানে কী?

আদিম মানুষ সবেমাত্র পৃথিবীকে জয় করতে শুরু করেছে। আর, সবেমাত্র জয় করতে শুরু করেছে বলেই সবেমাত্র চিনতে শিখছে এই পৃথিবীর নিয়মকানুন। তাই দুনিয়া সম্বন্ধে তার ধারণাটায় অনেকখানি ছেলেমানুষি। তবু সে হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে বসে থাকে নি। তার ওই সামান্য হাতিয়ার দিয়ে পৃথিবীকে যতোটুকু জয় করা যায় শুধু ততোটুকু জয় করে তার মন খুশি হয় না। তাই, পৃথিবীকে আসলে জয় করবার যে-অভাব সেটা কল্পনায় জয় করা দিয়ে পূরণ করে নেওয়া। এরই নাম হলো ইন্দ্রজাল।

কিন্তু কল্পনায় জয় করা মানে কী? ধরা যাক, বিদ্যুৎ আর বজ্র। আজকের মানুষ আমরা, আমরা জানি বিদ্যুৎ কেন চমকায় আর কানে আসে বজ্রপাতের দারুণ শব্দ। কিন্তু আদিম মানুষ এতো কথা মোটেই জানতে পারে নি। সে শুধু এইটুকু বুঝেছিল যে বজ্র আর বজ্রপাতের শব্দ —এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে। তাই সে ভাবতো কোনোমতে যদি এই শব্দটাকে দখলে আনা যায় তাহলে জয় করা যাবে বজ্রকেও। যে পারবে বজ্রের মতো শব্দ করতে তার মধ্যে আবির্ভূত হবে বজ্রের শক্তি, সে বজ্র হয়ে যাবে। আদিম মানুষ তাই বজ্রের মতো শব্দ সৃষ্টি করবার নানান রকম কায়দাকানুন শুরু করলো, হয়তো পারলো একটা দারুণ শব্দ সৃষ্টি করতেও। আর তারপর ভাবলো, বজ্রের মতো ওই শব্দকে নিজের কবলে এনে সত্যিই বুঝি জয় করা গিয়েছে বজ্রকেই। এই হলো ইন্দ্রজাল, সত্যিকারের জয় করবার অভাবকে কল্পনায় জয় করা দিয়ে পূরণ করবার চেষ্টা।

কিংবা ধরা যাক আকাশে বৃষ্টি নেই। বৃষ্টি না পড়লে গাছ-গাছড়া শুকিয়ে মরে যাবে, দুস্কর হবে পেট ভরানো। তাই জয় করতে হবে আকাশের বৃষ্টিকে —তা নইলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? তাই আদিম মানুষের দল হয়তো আকাশের দিকে জলের ছিটে ছুঁড়তে শুরু করলো আর ভাবলো এমনিভাবে যদি আকাশে একটা বৃষ্টির নকল তোলা যায় তাহলে সত্যিই বৃষ্টি পড়তে বাধ্য হবে, তার মানে জয় করা যাবে বৃষ্টিকে। এই হলো কল্পনায় জয় করা। যার নাম কি না ইন্দ্রজাল।

ওদের এই সব ছেলেমানুষির কথা শুনে আজকের মানুষ আমরা, আমরা হয়তো মনে মনে হাসবো। কিন্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। এইসব ইন্দ্রজাল —কল্পনায় এই ভাবে পৃথিবীকে জয় করবার চেষ্টা —এর থেকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবীকে সত্যিকারের জয় করবার ব্যাপারে অনেকখানি সুবিধে হয়ে যেতো। তাই ইন্দ্রজাল ওদের কাছে খামখেয়াল নয়, ইন্দ্রজাল না হলে ওদের পক্ষে তখন বাঁচাই দুস্কর। মনে রাখতে হবে, আদিম মানুষ থাকতো একসঙ্গে, দল বেঁধে, সমানে-সমান হয়ে। ওরা যা কিছু করতো তাও একসঙ্গে, একজোটে। এমন কি, ওরা যা কিছু ভাবতো তাও একসঙ্গে, একজোটে। এবার ভেবে দেখো ঃ বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি না হলে বাঁচবার উপায় নাই। আদিম মানুষের দল একজোট

হয়ে তালে তালে নাচতে শুরু করলো, —নাচের সময় আকাশের দিকে জলের ছিটে ছোঁড়া, বৃষ্টির একটা নকল তোলা। অনেক সময় মানুষ একসঙ্গে তালে তালে নাচছে আর একসঙ্গে ভাবছে ঃ এবার আর ভয় নেই, আকাশের বৃষ্টিকে এবার জয় করা গিয়েছে, বৃষ্টি এবার হতে বাধ্য, বৃষ্টি এবার হবেই হবে। তাই তাদের সবাইকার মনেই এক নতুন উৎসাহের সাড়া, —তারা সবাই মিলে একসঙ্গে সাহসে বুক বাঁধছে, মেতে উঠছে। ভাবছে, ভয় নেই আর; ভাবছে, ভাবনা নেই আর। আর এইভাবে একসঙ্গে সাহসে বুক বেঁধে তারা যখন চললো মাঠের দিকে খাবার জোগাড় করতে তখন তাদের পক্ষে সত্যিকারের খাবার জোগাড় করাটা, —পৃথিবীকে সত্যিকারের জয় করাটা, —অনেক বেশি সহজ হয়ে পড়বারই কথা নয় কি? আকাশে জল নেই দেখে মানুষ যদি মনের দুঃখে শুধুই চোখের জল ফেলতো তাহলে তার পক্ষে তখন বাঁচাই সম্ভব হতো না। তাই কল্পনায় বৃষ্টিকে জয় করে ওই যে নতুন আশায় বুক বাঁধা, মেতে ওঠা, ওর দাম খুব কম নয়।

আমাদের দেশে যাকে বলে 'ব্রত' তার মধ্যে আজও অনেকখানিই ওই ইন্দ্রজাল। অবশ্য আজকাল আসল আর খাঁটি আর পুরোনো ব্রতগুলোকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের লোক যতো সভ্য হয়েছে ততোই পুরোনো ব্রতর সঙ্গে মিশেছে নানান রকম ভেজাল, ঠাকুর দেবতার কথা। কিন্তু যেগুলো আসলে পুরোনো ব্রত সেগুলোর চোদ্দ আনাই হলো ইন্দ্রজাল। এ-সব ব্রত একা একা করবার কথা নয়, একসঙ্গে দল বেঁধে করবার কথা। এ-সব ব্রতর সঙ্গে থাকে একটা করে কামনা ঃ যারা ব্রত করছে তারা ভাবছে ব্রতটা করতে পারলেই কামনাটা সফল হবে। তাই পৃথিবীকে যেন মনে মনে জয় করা, কল্পনায় জয় করা। তবুও কথাটা হলো জয় করবার কথাই। যেগুলো আসলে পুরোনো ব্রত সেগুলোর মধ্যে ঠাকুরদেবতার কাছে মিনতি করবার কথা নেই, ফুল-নৈবেদ্য সাজিয়ে ঠাকুরদেবতাকে খুশি করবার কথা নেই, নেই তাদের পায়ে মাথা কোটবার কথা। এ-সব ব্যাপারের নাম হলো ধর্ম। এ-সব ব্যাপার মানুষ শিখেছে অনেক পরে। মনে রাখতে হবে, ইন্দ্রজালের সঙ্গে ধর্মের তফাতটা মস্ত বড়ো। ধর্ম হলো ঠাকুরদেবতাকে খুশি করে তাদের কৃপায় কিছু পাবার আশা, কিন্তু ইন্দ্রজাল হলো পৃথিবীকে জয় করা, জোর করে বশ করা। তাই আকাশে বৃষ্টির চিহ্ন না দেখে মানুষ যদি ভয়ের চোটে আকাশের দেবতার পায়ে মাথা কুটতে চায় তাহলে সেটা হবে ধর্ম, কিন্তু তার বদলে মানুষ যদি আকাশে বৃষ্টির নকল তুলে বৃষ্টিকে বশ করতে চায় তাহলে সেটা হবে ইন্দ্রজাল। এটা নিশ্চয়ই আসল জয় করা নয়, কল্পনায় জয় করা, জয় করা গিয়েছে বলে মনে করা। ওটাই ছিলো আদিম মানুষের আসল ভুল। বেচারারা তো সবেমাত্র পৃথিবীকে জয় করতে শুরু করেছে। তাই পৃথিবীকে চিনতেও শুরু করেছে সবেমাত্র। তাই এই ভুল। তবু ওরা হাত গুটিয়ে চোখের জল ফেলবার লোক নয়, ভিক্ষে পাবার আশায় ওরা কারুর পায়ে মাথা কুটতে শেখে নি। এইটেই হলো ওদের বেলায় সবচেয়ে বড়ো কথা। ওরা ছিলো কাজের মানুষ, ওরা মানতো নিজেদের হাতকে, হাতিয়ারকে। ওরা জানতো না অসহায়ের মতো করুণা ভিক্ষে করতে।

আদিম মানুষের নাচ, গান আর ছবি। এ-সবেরই পেছনে ওই এক কথা, ওই ইন্দ্রজাল। তার মানে, ওদের কাছে এগুলো মেহনত করবার অঙ্গ, শুধু ফুর্তি করা নয়। তাই আদিম মানুষের কাছে 'কাজ করা' আর 'নাচা' দুই-ই এক কথা।

আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব আদিম আর অসভ্য মানুষের দল টিকে আছে তাদের দিকে একটু ভালো করে চেয়ে দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। যেমন ধরো মেক্সিকো দেশের কথা। ও-দেশে নানান দলের মানুষ এখনো সেই আদিম অবস্থায় পড়ে রয়েছে; তাদের মধ্যে এক দলের নাম হলো 'তারাহুমারে'। তাদের ভাষায় একটা কথা আছে 'নোলাভোয়া' —কথাটার মানে 'মেহনত করা' আর 'নাচা' দুই-ই। ওদের মধ্যে বুড়োরা ছেলে-ছোকরাদের ধমক দিয়ে বলে, ঘরের কোণায় কুঁড়ের মতো বসে থেকো না, দলের সঙ্গে নাচে যোগ দিতে যাও। ওদের মধ্যে 'বয়সে বাড়বার' আর একটা নাম হল 'নাচের সংখ্যা বাড়া'। নাচের সংখ্যা যার যতো বেশি, —তার মানে দলের নাচে যে যতো বেশি বার যোগ দিয়েছে —তার কদরও তত বেশি। কথাগুলো আমাদের কাছে কেমন যেন খাপছাড়া লাগে, মনে হয় মানে হয় না। কিন্তু ওদের কাছে তা নয়। কেননা, নাচা আর কাজ করা ওদের কাছে একই ব্যাপার —দুই-ই হলো পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করবার কায়দাকানুন। তাই কাজের সঙ্গে নাচের যেন মেশামেশি। কেউ যদি দলের নাচে যোগ দিতে না যায় তাহলে সে ধমক খায়; কেউ যদি অথর্ব হয়ে পড়ে, নাচতে না পারে, তাহলে সে কপাল চাপড়ে বলে ঃ বেঁচে থেকে আর লাভ কী?

আরো একটা কথা ভেবে দেখো। আদিম মানুষের কাছে নাচ যদি নেহাতই আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার হতো তাহলে তো যুদ্ধে জিত হবার পর কিংবা শিকার গেলে ফিরে আসবার পরই নাচবার কথা হতো। কিন্তু তা নয়। ওদের নাচের সময়টা ঠিক উলটো। যুদ্ধে বেরুবার আগে নাচ, শিকার করতে বেরুবার আগে নাচ। আর নাচটা যেন যুদ্ধে জিত হয়ে গিয়েছে, কিংবা শিকার জুটেছে খাসা —তারই কল্পনা। একসঙ্গে দল বেঁধে এই নাচ নাচতে নাচতে সবাইকার মনই উৎসাহে মেতে ওঠে। চোখের সামনে দোলে কামনা সফল হবার ছবি। এই উৎসাহে বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়া। তখন সত্যিকারের যুদ্ধে জেতা বা সত্যিকারের শিকার জোগাড় করা অনেকখানি সহজ হবে না কি?

গানের বেলাতেও ওই কথাই। তার মানে, গানের সঙ্গেও মেহনতের যোগাযোগ। ওদের গান শৌখিনতা নয়, একসঙ্গে তালে তালে কাজ করবার একটা কায়দা। আজকের দিনেও যারা দল বেঁধে মেহনত করে তাদের দিকে চেয়ে দেখো। দেখবে একসঙ্গে মিলে মেহনত করবার জন্যে তাদের কাছেও গানের দরকার, সুরের দরকার কতোখানি। ছাত পেটাবার গান শোনো নি? ভারি জিনিস টানবার সময় শ্রমিকেরা দল বেঁধে যে-গান গায় সে-গান শুনেছো তো? তা ছাড়া ধান কাটবার গান, ঘাস কাটবার গান —এই রকম নানান রকম গান। এগুলো শৌখিন গান নয়, অবসর-বিনোদন-নয়। মেহনত করবার এক রকম কায়দা-কানুনই। আদিম মানুষের দল যেটুকু গান শিখেছিলো সেটুকু গান এই রকমই।

ছবির বেলাতেও এই কথা। ওদের ছবি হলো চোদ্দ আনা ইন্দ্রজাল। পাঁচজনকে ছবি দেখিয়ে খুশি করবার জন্যে ছবি আঁকা নয়। তাই যে-সব জায়গায় ওদের আঁকা ছবির আবিস্কার হয়েছে সেগুলো বড়ো বেয়াড়া ধরনের জায়গা ঃ অন্ধকার গুহার একেবারে ভেতর দিককার দেয়ালে এইসব ছবি, কখনো বা এমন জায়গায় ছবি যে দেখলে বোঝা যায় শুয়ে শুয়ে আঁকতে হয়েছে। লোককে দেখিয়ে খুশি করবার ইচ্ছেই যদি হতো তাহলে অমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় অতো সুন্দর সুন্দর ছবি মানুষ আঁকতে যাবে কেন?

ইন্দ্রজাল। তার পেছনে পৃথিবীকে জয় করবার চেষ্টাই। ভিক্ষে চাওয়া নয়, প্রার্থনা করা নয় —জয় করাই। তবে কল্পনায় জয় করা।

তা হোক। সেই সঙ্গেই কিন্তু আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা নইলে মানুষের গল্পটা বুঝতে গিয়ে আবার ভুল হয়ে যেতে পারে।

কথাটা হলো ঃ আমরা কি আজও ওই ইন্দ্রজাল নিয়েই মেতে থাকবো, বাঁচবার কায়দা খুঁজবো ব্রত পালন করে? নিশ্চয়ই নয়। কেননা এর মধ্যে পৃথিবীকে জয় করবার চেষ্টা থাকলেও সেটা যে নেহাতই কল্পনায় জয় করা। মানুষের হাতিয়ার যতোদিন নেহাতই স্থূল, নেহাতই বাজে ধরনের ততোদিন না হয় ওইভাবে জয় করবার কল্পনা ছাড়া তার পক্ষে বাঁচবার উপায়ই ছিলো না। কিন্তু আজকের দিনে তার আবার দরকার পড়বে কেন? কতো আশ্চর্য আর উন্নত হয়ে উঠেছে আমাদের আজকের হাতিয়ার, পৃথিবীকে সত্যিকারের জয় করতে আমরা শিখেছি কতো বেশি করে। এই যে সত্যিকারের জয় করা, এরই নাম হলো বিজ্ঞান। আজ আমরা বিজ্ঞানকেই মেনে নেবো, ইন্দ্রজালের দিকে পিছু হটতে চাইবো না।

ছোট্ট বেলায় ঝিনুক-বাটিতে দুধ খেতে হয়; ঝিনুক-বাটি না হলে চলে না। কিন্তু তাই বলে বড়ো বয়সেও তো আর ঝিনুক-বাটি দরকার পড়ে না। তেমনি মানুষ যখন ছেলেমানুষ ছিলো তখন ইন্দ্রজাল না হলে তার চলতোই না। কিন্তু তারপর মানুষ অনেক বড়ো হয়েছে। এখন তাই ইন্দ্রজালের বদলে বিজ্ঞান।

মানুষের শত্রু মানুষ

মানুষের গল্প হলো পৃথিবীকে জয় করবার গল্প।

কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি ঃ একজন মানুষ পৃথিবীকে কতোখানি জয় করতে পারে? পৃথিবীর কাছ থেকে কতোটা জিনিস আদায় করতে পারে? ফলাতে পারে কতোটা ফসল, বুনতে পারে কতোটা কাপড়, গাঁথতে পারে কতোখানি ঘর? —এক কথায় কোনো জবাব দিতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়। কেননা, জবাবটা অন্য একটা জিনিসের ওপর নির্ভর করছে, সে-জিনিসটার নাম হলো হাতিয়ার। হাতিয়ারটা যদি নেহাত বাজে ধরনের হয় তাহলে তাই দিয়ে প্রাণপণ খেটে একজন মানুষ পৃথিবীর কাছ থেকে বড়ো জোর এতোটুকু জিনিস আদায় করতে পারবে যা দিয়ে কোনোমতে নিজের জানটুকু বাঁচে। কিন্তু হাতিয়ারটা যদি খুব ভালো হয়? তাহলে নিশ্চয়ই অনেক জিনিস। যেমন ধরো, ছুঁচোলো পাথরের একটা টুকরো হাতে একজন মানুষ সারাদিন ভুতের মতো খেটেও, হয়তো আধ কাঠা জমি কোপাতে পারবে না, কিন্তু সেইমানুষকেই যদি একটা কলের লাঙল দাও তাহলে তার পক্ষে দিনে অমন বিশ-পঞ্চাশ বিঘে জমি চষা অসম্ভব নয়। হাতিয়ার যতো ভালো, যতো উন্নত, পৃথিবীকে জয় করতে পারা যায় ততো বেশি করে ততো ভালো করে। দিনের পর দিন মানুষের হাতিয়ার অনেক উন্নত, অনেক ভালো হয়েছে। তাই দিনের পর দিন মানুষ পৃথিবীকে জয় করে চলেছে অনেক অনেক বেশি করে। মানুষের দিগ্বিজয়ের যেন শেষ নেই।

কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, এই দিগ্বিজয়ের কথার উলটো পিঠেই লেখা আছে এক ধরনের পরাজয়ের কাহিনী। এতো যে গৌরব তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী আর নোংরা লজ্জার ব্যাপার। সেই ব্যাপারটার কথা বলি।

মানুষ চাষবাস করতে শিখলো, পশুকে পোষ মানাতে শিখলো, আর তারও ঢের পরে শিখলো লোহা গলাতে : দেখা গেলো মানুষের ক্ষেতে মানুষের পোষা জানোয়ার মানুষের তৈরি লোহার লাঙল টানছে —পৃথিবীকে যে কতোখানি জয় করতে পারা তা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। ফলে মানুষের জীবনে যেন আকাশ-পাতাল তফাত দেখা দিলো। আকাশ-পাতাল তফাত নয় কি? পৃথিবীর কাছ থেকে কতো বেশি জিনিস আদায় করতে পারা —এতো বেশি যে আগেকার তুলনায় আকাশ-পাতাল তফাতই। তাই মানুষের পক্ষে ওই পশুপালন আর চাষবাস করতে শেখাটাকে দারুণ রকম এগিয়ে আসাই বলতে হবে। কতোখানি বাড়লো মানুষের শক্তি! কতোখানি বাড়লো মানুষের সম্পদ!

তবুও কিন্তু ভুললে চলবে না, এতোখানি এগিয়ে আসতে গিয়ে মানুষ যেন পেছনে ফেলে এলো একটা মস্তবড়ো আনন্দ আর শান্তির দিক। সেটা হলো, আগেকার কালের ওই সমানে-সমান সম্পর্ক। দিনের পর দিন মানুষ কতো এগিয়ে চলেছে সেই গল্পের জের একটু পরেই আবার ধরবো। কিন্তু যে-জিনিসটাকে মানুষ পেছনে ফেলে এসেছে সেইটার কথা ভুললে চলবে না। কেননা, অনেক দূর এগিয়ে, অনেক অনেক ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও, আজকের দিনের মানুষ বুঝতে পারছে ওই সমানে-সমান সম্পর্কটাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা নইলে, মানুষের জীবনে আনন্দ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই। তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে আজকের দিনের মানুষ আগেকার কালের সেই ছেলে-মানুষের দশায় ফিরে যেতে চাইবে। সে জীবন যে অসহ্য অভাব আর অসহ্য দৈন্যের জীবন। সেখানে ফিরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাকে নতুন করে পাতাতে হবে। আর নতুন করে পাতাবার সময় খেয়াল রাখতে হবে সমানে-সমান হয়ে বাঁচবার দিকে। তাই, উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে চলতে মানুষ যে-জিনিসটা পেছনে ফেলে এসেছে —আদিম যুগের সেই সমানে-সমান সম্পর্ক-সেই সম্পর্কটাকে আজ আবার নতুন করে কিন্তু ঢের উন্নতভাবে ফিরিয়ে আনবার দরকার। একটু ভাবলেই দেখতে পাবে, সেই সম্পর্কটা পেছনে ফেলে আসবার দরুন মানুষের আসলে কতো রকমের ক্ষতি হয়েছে, জুটেছে কত রকমের দুঃখ।

এর আগে পর্যন্ত মানুষের দল থাকতো মিলে-মিশে, একসঙ্গে। দলের মধ্যে সকলেই সমান। বড়োলোক-ছোটোলোকের তফাত নেই, তফাত নেই বড়োমানুষ-গরিব মানুষের; সকলেই মেহনত করে, আর সবাইকার মেহনতের যা মোট ফল তা দলের সবাইকার মধ্যে মোটামুটি সমান ভাগে ভাগ করে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু পৃথিবীকে বেশি করে, ভালো করে, জয় করতে শেখবার পর ওই পশুপালন আর চাষবাষ শেখবার পর—ভেঙে গেলো মানুষে-মানুষে সেই সমানে-সমান সম্পর্ক। দেখা গেলো, মানুষের দল দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে শুধু একভাগ মানুষের ওপরেই মেহনতের আসল দায়টা, —আর একদল মানুষ গতর খাটায় না, আয়েস করে। কিন্তু যারা মেহনত করে তাদের কপালেই যতো দুঃখ : তারা ভালো করে খেতে পায় না, পরতে পায় না, পায় শুধু ততোটুকু জিনিসই যা নইলে কোনোমতে জান বাঁচে না। অথচ মানুষের যা-কিছু জিনিস তার সবটুকু ওদেরই

মেহনত দিয়ে তৈরি। তার মানে, ওদের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস অন্যরা কেড়ে নেয়। অন্যেরা মানে কারা? ওই যারা শুধু আয়েস করে তাদের দল। তার মানে, একদল মানুষ মুখে রক্ত তুলে মেহনত করছে আর একদল মানুষ সেই মেহনতের ফল লুঠ করছে, মজা মারছে। যারা মেহনত করছে তারা সবাই ছোটোলোক আর গরিবলোক; যারা লুঠ করছে তারাই হলো বড়োলোক, তাদেরই খাতির সব চাইতে বেশি। এইটেই হলো নোংরা ব্যাপার, বিশ্রী ব্যাপার; এইটের কথা ভুলে গেলেও ভুল হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা শুরু হলো কেমন করে আগে তাই বলি। যতোদিন মানুষের হাতিয়ার খুব বাজে ধরনের ততোদিন পর্যন্ত এ-রকম কোনো ব্যাপার শুরু হওয়া সম্ভবই নয়। কেননা, ওই হাতিয়ার হাতে সারাদিন মেহনত করে একজন মানুষ যতোটুকু জিনিস জোগাড় করতে পারে ততোটুকু দিয়ে কোনোমতে তার জান বাঁচে। তাই এ-অবস্থায় কারুর পক্ষেই অপরের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করবার কথা ওঠে না। লুঠ হয়ে গেলে, যার মেহনত সে-বেচারা যে প্রাণেই মারা যাবে, আর যদি প্রাণেই মারা যায় তাহলে সে আর মেহনত করবে কেমন করে? কিন্তু হাতিয়ার উন্নত হবার পর অন্য কথা। তখন থেকে পৃথিবীকে বেশি করে জয় করতে শেখা। তাই, তখন থেকে সম্ভব হলো মানুষের পক্ষে বাড়তি জিনিস তৈরি করতে পারা ঃ নিছক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যতোটুকু জিনিস দরকার তার চেয়ে খানিকটা বেশি -তাই বাড়তি জিনিস। আর তাই, মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করবার সম্ভাবনা। যে-লোক মেহনত করছে তার কপালে জুটবে শুধু ততোটুকু জিনিস যতোটুকু না হলে বেচারার জান যাবে, অথচ তারই মেহনত দিয়ে তৈরি বাড়তি জিনিসটুকু লুঠ করে নেবে অন্য কেউ।

দেখা গেলো, লোক খাটিয়ে লাভ আছে। কিন্তু খাটানো যায় কোন্ লোককে? নিজের দলের মধ্যে কেউ যদি কাউকে ডেকে বলে ঃ বাপুহে, তুমি আমার হয়ে খেটে দাও, কিন্তু তোমার খাটুনির যা ফল তা থেকে তুমি পাবে শুধু সেইটুকু যেটুকু না হলে তোমার ধড়ে আর প্রাণ থাকে না; বাকি জিনিসটা আমি মেরে দেবো, -তাহলে নিশ্চয়ই যাকে এ-কথা বলা হবে সে মনের সুখে এতে রাজি হয়ে যাবে না। তাহলে, এ-রকম মুখ বুঁজে মেহনত করবার মতো লোক জোগাড় করা যায় কোথা থেকে? প্রথম দিকটায় জোগাড় হতো দলের বাইরে থেকে। কেমন করে? ধরা যাক, দুটো দলের মধ্যে লড়াই হলো। লড়াইতে একদল জিতলো, একদল হারলো। যারা হারলো তাদের মধ্যে অনেকেই বন্দী হলো। কিন্তু এই বন্দী মানুষগুলোকে নিয়ে কী করা যায়? যতোদিন মানুষ পৃথিবীকে ভালো করে জয় করতে শেখে নি ততোদিন পর্যন্ত এদের প্রায়ই মেরে ফেলা হতো। কেননা ততোদিন পর্যন্ত দলের লোককে পেট ভরে খেতে দেওয়াই এক দারুণ সমস্যা, তাই দলের বাইরের লোককে দলের মধ্যে এনে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার কথা ওঠে না। কিন্তু হাতিয়ার উন্নত হবার পর থেকে অন্য কথা। তখন বন্দীদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটা নেহাত লোকসানের ব্যাপার নয়, বরং খুব লাভের ব্যাপারই। কেননা তখন থেকে মানুষের মেহনত দিয়ে তৈরি হয় খানিকটা করে বাড়তি জিনিস, ওই বাড়তি জিনিসটুকুই হলো আসল লাভের ব্যাপার। তাই বন্দীদের আর মেরে ফেলা নয়, মেরে ফেলবার বদলে দাস করে রাখা। মুখ বুজে মেহনত করবে তারা, কিন্তু তাদের কপালে জুটবে শুধু উচ্ছিষ্ট অন্ন আর জীর্ণ বসন।

মানুষ শিখলো পৃথিবীকে বেশি করে জয় করতে আর শিখলো লুঠ করতে অপরের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস। আর তারই ফলে, দল বেঁধে সমানে-সমান হয়ে বেঁচে থাকবার তাগিদটা গেলো ঘুচে। মানুষ চাইতে শিখলো জমানো জিনিসগুলো একেবারে নিজের করে নিতে। কিন্তু যে-জমিতে চাষ হচ্ছে সেই জমি, যে-পশুকে পালন করা হচ্ছে সেই পশুকে, যে-দাস মেহনত করে দিচ্ছে সেই সব দাস-যদি এ-সবের ওপর পুরো দলটার সকলের সমান অধিকার থাকে তাহলে তো কারুর পক্ষেই নিজস্ব কিছু জমানো সম্ভব হয় না। তাই জমির ওপর, দাসের ওপর, পশুর ওপর, আলাদা আলাদা দখল বসতে লাগলো। দলের জমি দলের লোকদের মধ্যে আলাদা আলাদা করে বিলি করা হলো। যাদের ভাগে ভালো জমি পড়লো তারা বেশি ফসল পেতে শুরু করলো, তাদের ঘরে জমতে লাগলো বেশি সম্পত্তি। তারা হলো বড়োলোক। দেখা দিলো বড়োলোক আর গরিবলোকের মধ্যে তফাত। এর আগে পর্যন্ত সবাই গরিব, –অসম্ভব গরিব, -তবু সবাই সমান।

চুরমার হয়ে গেলো মেহনতের মর্যাদা। যতোদিন পর্যন্ত সকলে সমানে-সমান ততোদিন পর্যন্ত সবাইকেই মেহনত করতে হয়। মেহনত না করলে যে বাঁচবারই উপায় নেই। তাই কেউ যদি দলের মেহনতে যোগ না দিতে পারে, যদি অথর্ব হয়ে পড়ে, তাহলে সে কপাল চাপড়ায়, পরের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টাটা যে চরম লজ্জা। জীবন আর মেহনত দু-ই ছিলো সমান। কিন্তু অপরের মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস লুঠ করতে শেখবার পর মানুষ ভাবলো, যারা ছোটোলোক, যারা দাস, তারা ইতর,–শুধু তারাই তো মেহনত করবে। মেহনত করাটাই হলো ইতরের লক্ষণ। তার কোনো মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, কিছু নেই।

আগে ছিলো শুধু পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের লড়াই। কিন্তু এখন থেকে দেখা দিলো মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই। যারা মেহনত করবে তাদের সঙ্গে যারা অপরের মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস লুঠ করবে তাদের লড়াই।

সিপাই-শান্ত্রী পাণ্ডা-পুরুত

পৃথিবীকে অনেক বেশি করে, অনেক ভালো করে, জয় করতে পারা। কী আশ্চর্য এই কীর্তি। ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়! গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান-মানুষ আর ভোঁতা হাতিয়ার হাতে খাবার জোগাড়ের আশায় বনে বনে হন্যে হয়ে ঘুরতে বাধ্য নয়! ওই সুদূর অতীতে পৃথিবীকে ওইভাবে জয় করতে শুরু করেছিলো বলেই মানুষ আজ সভ্যতার কোন্ আশ্চর্য শিখরে উঠে আসতে পারলো! ওইভাবে উঠে আসবার গল্পই হলো মানুষের আসল গল্প।

তবু সে-গল্প শোনাবার সময় ভুলে গেলে চলবে না যে সুদূর অতীতে ওই অসহ্য দারিদ্র্যের জীবন ছেড়ে আসবার সময়, অভাবের অন্ধকার থেকে প্রাচুর্যের আঙিনায় এগিয়ে আসবার জন্যে, মানুষকে মূল্যও দিতে হয়েছে অনেকখানি। আগেকার দিনে সমানে-সমান সম্পর্কটা গিয়েছে খোয়া। এ-কথায় কোনো সন্দেহই নেই যে ওই রকমের একটা দারুণ মূল্য চুকোতে না পারলে মানুষ আজ এমন বড়ো হতে পারতো না। তাই, তখনকার যুগে

সমানে-সমান সম্পর্কটা হারাতে হয়েছিলো বলে চোখের জল ফেলবারও সত্যিই মানে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মানুষ দেখছে মানুষে-মানুষ সম্পর্কটাকে আবার যদি সমানে-সমান করে নেওয়া না হয় তাহলে শান্তি নেই, সুখ নেই। আজকের দিনে তাই আবার ভালো করে ভেবে দেখা দরকার আদিম যুগের সমানে-সমান সম্পর্কটা খোয়া যাবার কথা। এই সম্পর্কটা হারানোর অনেকগুলো দিক আছে। সেই দিকগুলোর কথাই একে একে বলি।

যেমন ধরো, সিপাই-শাস্ত্রী। যেমন ধরো, পাণ্ডা-পুরুত। এরা কারা? এরা এলোই বা কোথা থেকে?

মানুষ যতোদিন পর্যন্ত দল বেঁধে সমানে-সমান হয়ে থাকতো ততোদিন পর্যন্ত মানুষকে শাসন করবার জন্যে কোনো ব্যবস্থার দরকার পড়ে নি। দলের কাজ চালাতো দলের মোড়ল আর সর্দার, আর এই মোড়ল আর সর্দার চলতো দলের সবাইকার মত মেনে। কিন্তু মানুষের দল দুভাগে ভাগ হয়ে যাবার পর দরকার পড়লো শাসন করবার ব্যবস্থা। কেননা, তখন থেকে আর সবাই সমানে-সমান নয়, সবাই স্বাধীন নয়। মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই ভাব গেছে ভেঙে, দেখা দিয়েছে লোভ, লুঠতরাজ, মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই। কিন্তু সবাই যদি লুঠতরাজ করতে যায়, সবাই যদি মারামারি আর কাটাকাটি নিয়ে মেতে ওঠে, তাহলে মানুষের দল একেবারে চুরমার হয়ে ভেঙে যাবার ভয়। তাই দরকার পড়লো কতকগুলো আইনকানুনের। আইন-কানুনগুলো সবাইকে মানতেই হবে, না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা। শাস্তির ভয়ে আইন-কানুন মানা —এমনতরো ব্যাপার এর আগে দরকার পড়ে নি। কেননা, মানুষ তখন জানের দায়ে পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করছে, হাতিয়ার উন্নত হয় নি বলেই দল বেঁধে একসঙ্গে মিলে লড়াই করছে; প্রাণ পণে পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে যতোটুকু জিনিস পাওয়া যায় ততোটুকু দিয়ে কোনোমতে সবাইকার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। তাই সবাই গরিব, তবু সবাই স্বাধীন। সবাই মিলে যে-কাজটা করে সে-কাজটা সম্বন্ধে উচিত-অনুচিতের কথা, আইন-বেআইনের কথা, ওঠে না। কিন্তু তারপর থেকে অন্য কথা - মানুষে মানুষে মারামারি আর কাটাকাটি। এই অবস্থায় কতকগুলো আইন-কানুন যদি না থাকে তাহলে মানুষের দলটা টিকবে কেমন করে?

কিন্তু শুধু কতকগুলো আইন-কানুন তৈরি করলেই তো হলো না, সবাই যাতে সেগুলো মানতে বাধ্য হয় সেই ব্যবস্থাও করা দরকার। সেই ব্যবস্থারই নাম হলো শাসন করবার ব্যবস্থা। আইন-কানুনগুলো সবাই ঠিকমতো মানছে কিনা তারই তদারক করবার ব্যবস্থা। বিচার করবার লোক চাই ঃ আইনগুলো কে মানলো আর কে মানলো না তারই বিচার। তাছাড়া সিপাই চাই, শাস্ত্রী চাই, জল্লাদ চাই, কোটাল চাই। যারা আইন মানবে না তাদের তাঁবে রাখার জন্যে। আস্তে আস্তে মানুষের দলের মধ্যে দেখা দিলো কাজি-উজির, জল্লাদ-কোটাল, সিপাই-শাস্ত্রী। এরা শাসন করবে মানুষের দলকে, হিসেব করে দেখবে কে আইন মানলো আর কে আইন মানলো না; যে মানলো না তাকে ধরে আনতে হবে, তাকে শাস্তি দিতে হবে। শাসন বলে ব্যবস্থা না থাকলে তখন মানুষের দল টিকতে পারে না, তাই যাদের ওপর শাসনের ভার তাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়টা পড়লো বাকি সবাইকার ঘাড়ে। পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করে যে যা-কিছু জোগাড় করবে তার একটা করে অংশ যাবে এই শাসকদের পেট ভরাবার জন্যে। সেই অংশটারই নাম হলো খাজনা।

প্রথমটায় মনে হতে পারে, খাসা ব্যবস্থা। কেউ যাতে অন্যায় করতে না পারে তারই জন্যে আইন-কানুন। আইন-কানুনগুলো যাতে কেউ না উড়িয়ে দিতে পারে তারই জন্যে শাসনব্যবস্থা। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবে এই ব্যবস্থার মধ্যে ফাঁকিটা ঠিক কোথায়। আইন-কানুনগুলো শুরু হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কালেই ওগুলোর উদ্দেশ্য নয় সমস্ত মানুষের যাতে ভালো হয় সেই ব্যবস্থা করা। সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বেশির ভাগ আইনের আদত কথাটা ঠিক কী? একদল মানুষ মুখ বুজে খাটবে, আর তাদের খাটুনি দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করবে আর একদল মানুষ। যারা মুখ বুজে খাটবে তারা যদি মুখ বুজে থাকতে রাজি না হয়? যদি রাজি না হয় নিজেদের মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস অপরের ভাঁড়ারে তুলে দিতে? তাহলে শাস্তি, শাসন। তাই আইন। ঘাড় গুঁজে কুঁজো হয়ে রাজাকে মানতে হবে, না মানলে দারুণ শাস্তি। বড়োলোককে মানতে হবে, বড়োলোকের ভাঁড়ার থেকে কানাকড়ি সরানো চলবে না। সরাতে গেলে শাস্তি, দারুণ শাস্তি। বেশির ভাগ আইন-কানুনই হলো এই ধরনের আইন-কানুন। শোষণের খাতিরেই শাসন। যদিও অনেক রকম রঙচঙে আর মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে এই সত্যি কথাটুকুকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও ভালো করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আইন-কানুন আর সিপাই-শান্ত্রী সব কিছুর পেছনে একটি হিসেব ঃ যাতে মেহনতকারীর দল হঠাৎ না বেঁকে দাঁড়ায়, হঠাৎ না রুখে ওঠে। তারই জন্যে এই সব ব্যবস্থা ঃ আইন-কানুন, রাজা-উজির, সিপাই-শান্ত্রী, হরেক রকমের।

কিন্তু শুধু ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা রাখাও কঠিন। কেননা, মেহনতকারীদের যে দল সেটাই হলো আসলে প্রকাণ্ড বড়ো দল। রাজা-উজিরই বলো আর বড়োলোকই বলো, গুনে দেখলে দেখা যায় বাকি মানুষদের চেয়ে-যারা খেটে মরছে তাদের চেয়ে– দলে ওরা নেহাতই নগণ্য। তাই, শুধু সিপাই-শান্ত্রী আর জল্লাদ-কোটাল দিয়ে চিরকালের মতো এদের দাবিয়ে রাখা যায় না। বনের বাঘকে খাঁচায় পুরে রাখলেও নিশ্চিন্তি নেই ; দরকার পড়ে নিয়ম করে বাঘকে আফিম খাওয়াবার। আফিম খেলে বাঘ ঝিমিয়ে পড়তে পারে এ-হেন দুশ্চিন্তার আর কারণ থাকবে না। বাঘের বেলায় যে-রকম ব্যবস্থা, মেহনতকারী মানুষদের বেলাতেও খানিকটা সেই ধরনেরই ব্যবস্থা গড়ে উঠলো। এই ব্যবস্থাটার নাম ধর্ম। ধর্ম বলে ব্যাপারটা অবশ্য নেহাতই জটিল; তাই নিয়ে অনেক কিছু ভাববার আর বোঝবার আছে। তবু আমাদের গল্পের এখানে যেটা বিশেষ করে বোঝা দরকার শুধু সেটুকুই বলবো। যাতে মেহনতকারী মানুষেরা মাথা তুলতে না পারে, যাতে তারা ঝিমিয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তারই একটা বড়ো উপায় বলতে ধর্ম।

সিপাই-শান্ত্রীর সহায় হিসেবে দেখা দিলো পাণ্ডা-পুরুতের দল। মেহনতকারী মানুষ যাতে মাথা তুলতে না পারে, যাতে ঝিমিয়ে থাকতে বাধ্য হয়, সেই জন্যে পাণ্ডা আর পুরুত। সিপাই-শান্ত্রীর হাতে তীর-ধনুক আর বল্লম-বর্ষা, পাণ্ডা-পুরুতের ঝুলিতে ধর্মের আফিম। তারা মানুষকে বুঝিয়ে বেড়াতে লাগলো পৃথিবীর সুখ-দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। মানুষের এই নশ্বর জীবনে যদি সুখ না জোটে, যদি দুঃখ ভোগ করতে হয়, তাহলেও তাই নিয়ে মন-মেজাজ গরম করবার কোনো মানে হয় না। কেননা, করুণাময় ভগবান সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী, এখানে যা কিছু ঘটছে তা সবই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়। তিনি সব মানুষকেই সমান ভালোবাসেন। তাহলে কারুর কপালে অতো সুখ আর কারুর কপালে

অতো দুঃখ কেন? বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা ধর্মের প্রচারক তারা বললো ঃ ঐ তো মজা! আসলে যে-লোক আগের জন্মে ভালো কাজ করেছে এ-জন্মে সে সুখভোগ করছে, যে-লোক আগের জন্মে খারাপ কাজ করেছে এ-জন্মে সে দুঃখভোগ করছে। এই হলো ভগবানের নিয়ম। তাই এ-জন্মে সুখ পাচ্ছো, না, দুঃখ পাচ্ছো -তাই নিয়ে মাথা ঘামিও না। মুখ বুজে ভগবানের আদেশ হলো রাজাকে ভক্তি করবার আদেশ, পাণ্ডা আর পুরোহিতের কথা মানবার আদেশ। যদি মুখ বুজে এই সব আদেশ পালন করতে পারো তাহলে পরজন্মে বা পরকালে তোমার কপালেও অনেক সুখ জুটবে। এ-জন্মে শাকান্ন পাচ্ছো না বলে ভগবানে ভক্তি হারিও না। আসলে ভগবান তোমাকে দুঃখ দিয়ে পরখ করে নিচ্ছেন। ইহকালে শাকান্নের অভাবটা যদি হাসিমুখে মানতে পারো তাহলে পরকালে তোমার পরমান্ন একেবারে সুনিশ্চিত। জীবনে যে-আনন্দ তুমি পেলে না সে-আনন্দ পাবার আশায় নিজে নিজে কিছু করে বসাটা একেবারে মূর্খতা; মঙ্গলময়ের পায়ে মাথা কোটো, তাঁর মনে করুণার উদ্রেক করো, তিনি তোমার মনস্কামনা পূরণ করবেন। তার ইচ্ছে অনুসারেই পৃথিবী চলে, তাই তার কাছে করুণা ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

অবশ্যই, মেহনতকারী মানুষরা যদি ভগবানের পায়ে শুধু মাথাই কোটে তাহলে পাণ্ডা-পুরুতদের সংসারই বা চলে কেমন করে? তাই ওরা প্রচার করতে শুরু করলো, শুধু কথায় ভগবানের মন ভেজে না। তার পায়ে মাথা কুটতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গেই তাকে চালকলার

নৈবেদ্য খাওয়াতে হবে, আর এই ভগবানের সঙ্গে যেহেতু পাণ্ডা-পুরুতদের খুব ভাবসাব সেই হেতু এদের জন্যে কিছু নগদ দক্ষিণা না আনলেই বা চলবে কেন?

প্রার্থনার মাহাত্ম্য। করুণা চাওয়া, ভিক্ষে চাওয়া, মাথা কোটা। মনে রাখতে হবে, মানুষ যতোদিন ছেলেমানুষ ছিলো, ছিলো দল বেঁধে মিলে মিশে সমানে-সমান হয়ে, ততোদিন মানুষের মাথায় এই করুণা-চাওয়া প্রার্থনা করবার কথা আসে নি। ততোদিন ছিলো ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজালের মধ্যে কল্পনার আর আজগুবি ধারণার দিকটা যতোখানিই থাকুক না কেন, এর আসল ঝোঁক হলো পৃথিবীকে জয় করবার দিকে। কিন্তু আগেকার সেই সমানে-সমান জীবন ভেঙে যাবার পর থেকে নষ্ট হলো জয় করবার দিকে ঝোঁকটাও। মানুষ শিখলো মাথা কুটতে, মানুষ ভাবলো বিধাতার কথা। যারা শোষক, পরের মেহনত লুঠ করে বড়োলোক হয়, তারা বাকি সবাইকে শেখাতে লাগলো এই বিধাতার কথাটা ঃ সবই ঘটছে বিধাতার কৃপায়, বড়োলোকদের ওপরে রাগ করে লাভ নেই, লাভ শুধু বিধাতার পায়ে মাথা কুটে।

মনের মতো কথা

আরো একটুখানি তলিয়ে দেখা যাক, দেখা যাক ঠিক কোন ধরনের কথাগুলো শাসকদের মনের মতো কথা। খুব মোটামুটিভাবে বললে বলতে হবে, এই ধরনের কথা আছে দুটো। এক হলো, এই যে দুনিয়া এটা আসলে সত্যি জিনিস নয়। আর দু-নম্বরের কথা হলো, এই দুনিয়াতে আসলে কোনো অদলবদল নেই, যা সত্যি তা চিরকাল একই রকম, তা বদলায় না। কথা দুটোকে ভালো করে বোঝবার দরকার আছে।

প্রথমত, দুনিয়াটাকে আমরা যেভাবে দেখি সেইভাবে দেখাটা ঠিক দেখা নয়। আমরা দেখি, এই দুনিয়ায় মাটি আছে, মাটির বুকে ফসল ফলায় মানুষ আর সেই ফসল খেয়ে পেট ভরে মানুষের। শাসকদের মনের কথা হলো, এই সবই ভুল দেখা। যেমন, ভুল করে মানুষ অনেক সময় দড়িতে সাপ দেখে -সেই রকম। আসলে ওখানে আছে দড়ি, সাপ নয়। তবু অন্ধকার আর অজ্ঞানের ঘোরে ভুল করে কেউবা ভাবলো সাপই। এও তেমনি। আছে অন্য রকমের জিনিস, সাধারণ মানুষ ভুল করে দেখছে মাটির পৃথিবী, রক্তমাংসে গড়া মানুষ, এই রকম কতোই না!

কিন্তু এই ধরনের কথাটাই শাসকদের মনের কথা কেন? কেননা, সাধারণ মানুষকে যদি কোনোমতে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে এই মাটির পৃথিবীটা সত্যি নয়, রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া মানুষগুলোও সত্যি নয়, সত্যি নয় মানুষের পেটের জ্বালা,সত্যি নয় অন্ন-বস্ত্র -যা দিয়ে পেটের জ্বালা মেটানো যায়, শীতের হাত থেকে শরীরকে বাঁচানো যায় -তাহলে সাধারণ মানুষের মনটা অন্য দিকে যাবে, মাটির পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করা জিনিসপত্তরগুলোকে আর তারা অতো দামী মনে করবে না। আর সাধারণ মানুষের মন যদি সত্যিই অন্যদিকে যায় তাহলে শোষকরা তো দিব্বি নিশ্চিন্তি।

ভেবে দেখো একবার। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটির বুকে ফসল ফলায় তারা যদি বলতে শুরু করে ঃ ওই ফসলটাই হলো সত্যি, ওই ফসল দিয়ে পেট ভরানোটাই হলো সত্যি ; আমি চাই ওই ফসল, যতোটা আমার মেহনত দিয়ে তৈরি ততোটার ওপর দখল

শুধু আমার, আর কারুর নয়' -তাহলে? যদি সমস্ত মেহনতকারী মানুষ মাটির পৃথিবীটাকে এইভাবে সত্যি বলে চিনতে শুরু করে, তাহলে শাসকদের মন ভয়ে কেঁপে উঠবে না কি? তাই শাসকদের মনের কথাটা উলটো ধরনে কথা। মাটির পৃথিবীটা সত্যি জিনিস নয়, এর পেছনে অন্য কিছু আছে, যা সত্যি, যা বাস্তব।

আর অদল-বদল। পৃথিবীটা কি সত্যিই বদলে যায়? আজ তার চেহারাটা যে-রকম আগামীকাল কি সেই রকম আর থাকবে না? বদলে গিয়ে অন্য রকম হয়ে যাবে? শাসকের দল নিশ্চয়ই আর্তনাদ করে বলবে ঃ না না, তা কিছুতেই নয়, তা কখনো হতেই পারে না। আজকের দিনে পরের মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস লুঠ করে যে-রকম মজায় দিন কাটছে বরাবরই যেন সেই রকম ভাবে দিন কাটে। পৃথিবী বদলে গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেলে চলবে কেন? আসলে, পৃথিবীতে অদল-বদল বলে আমরা যা কিছু দেখি তার সবটুকুই হলো দেখার ভুল। বদল আসলে নেই, ভুল করে মনে করছি বদল দেখছি বুঝি। এও ওই দড়িতে সাপ দেখারই মতো। শোষকের দল এই কথাটাও সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায়। বলতে চায়, পৃথিবীটা চিরন্তন, অদল-বদল বলে বাস্তবিকই কিছু নেই পৃথিবীতে।—

মোটামুটি এই দুটো কথাই হলো শাসকদের মনের মতো কথা। এই দুটো কথা যদি সাধারণ মানুষের মনে খুব গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া যায়, তাহলে তার মন একেবারে চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে থাকবে, শোষণের বিরুদ্ধে, শাসনের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই মন কোনোদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর মন যদি না ওঠে তাহলে হাতও উঠবে না। হাত না উঠলে নিশ্চিন্তি।

তাই ধর্ম ছাড়াও শাসকদের তরফ থেকে অন্য রকম ব্যবস্থাও বন্দোবস্ত আছে। মস্ত বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মুখ দিয়ে এই কথাগুলো প্রচার করানো। তারা সব এমনই ডাকসাইটে পণ্ডিত যে তর্ক করে দিনকে রাত বলে প্রমাণ দিতে পারেন! তুমি হয়তো স্পষ্টই বুঝছো যে তোমার দারুণ খিদে পেয়েছে, এক দলা ভাত গিললেই তোমার পেটের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু ওই সব বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এমন সব তর্কের মারপ্যাঁচ শুরু করবে যে তোমার কাছে সবকিছু গোলমাল হয়ে যাবে, আর তুমি শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হবে যে তোমার কথাটাই ভুল, ওদের কথাটাই সত্যি। মেহনত করবার সময়, গতর খাটাবার সময়, মানুষ স্পষ্টই দেখছে যে তার হাতের কোদালটা সত্যিকারের কোদাল, যে-মাটিটা কোপানো হচ্ছে সেটাও আসলে সত্যিকারের মাটি, আর শেষ পর্যন্ত যে-ফসলটা ফলছে সেটাও নেহাতই সত্যিকারের ফসল। কিন্তু মেহনতের কথাটা, গতর খাটাবার কথাটা, আলাদা কথা। যখন থেকে মানুষের সমাজ চিড় খেয়ে দু-ভাগে ভেঙে গিয়েছে তখন থেকেই গতর খাটানো আর মাথা খাটানোর মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই, গতর খাটাবার সময় যে-কথাটাকে স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হয় মাথা খাটিয়ে সেই কথাটাকেই একেবারে ভুল আর বাজে কথা বলে প্রমাণ করে দেওয়া।

যতো দিন কেটেছে ততোই ধারালো হয়েছে, শাণিত হয়েছে শোষকদলের পণ্ডিতদের এই সব যুক্তি-তর্কগুলো। দিনের পর দিন ধরে যারা দিনকে রাত করে চলেছে, আর সবাই মুগ্ধ হয়ে বলেছে ঃ কী অসাধারণ পণ্ডিত! কী বিদ্যা! কী বুদ্ধি! শোষকরা খাতির করে সভায় ডেকে এনেছে এইসব পণ্ডিতদের।

এমন কি আজকের পৃথিবীতেও এই ধরনের ব্যাপারে শেষ নেই। তার কারণ আজকের পৃথিবীতেও এক দিকে শোষক আর শাসক আর একদিকে মেহনতকারী মানুষ, যাদের ভুল বোঝানো দরকার। তারা হয়তো ক্ষেপে উঠবে, বলবে ঃ 'পৃথিবীকে বদল করবো আমরা! শেষ হবে শোষণ, পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আসবে।'

নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন

পৃথিবীটা সত্যি নয়। পৃথিবীকে বদল করা যায় না -এই কথায় সত্যিই যদি সাধারণ মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করতো? তাহলে? তাহলে মানুষের গল্পে এর চেয়ে বড়ো তোলপাড় নিশ্চয়ই আর কিছু হতে পারতো না। কেননা মানুষের গল্প হলো পৃথিবীকে জয় করবার গল্প। পৃথিবীকে বদল করবার গল্প। পৃথিবীটা সত্যি নয়, পৃথিবীকে জয় করা যায় না -এই সব কথায় মানুষ যদি সত্যিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করতো তাহলে থেমে যেতো মানুষের গল্প, নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যে-রকম জলের ডোবা হয়ে যায় সেই রকম অবস্থা হতো মানুষের গল্পের। ইতিহাসের।

তা হয় নি। কেন হয় নি তাই বলবো।

অবশ্য মালিকদের কাছে, যারা রাজা-উজির আর পাণ্ডা-পুরুত হয়ে বসেছে তাদের কাছে, পৃথিবীকে বেশি করে জয় করবার তাগিদটা বরাবরই বড়ো কম। কী হবে পৃথিবীকে অতোশতো বদল করে? তার চেয়ে বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের মেহনতকে যদি খুব ভালো করে, খুব নির্মমভাবে, শোষণ করা যায় তাহলেই-তো নিজের ঘরে জমবে দেদার সম্পত্তি, পাওয়া যাবে ঢালাও ফুর্তি। সমস্ত মানুষের কথাটা ভাবলে অবশ্য অন্য কথা। তাহলে পৃথিবীকে বেশি করে জয় করায় লাভ আছে বৈকি। যতো বেশি করে জয় করা যাবে ততোই দুঃখের আর অভাবের চিহ্ন মুছবে সবাইকার কপাল থেকে। কিন্তু মালিকদের দায় পড়েছে সমস্ত মানুষের কথা ভাবতে! শুধু নিজের সুখ-সুবিধেটুকু নিয়ে ব্যস্ত বলেই পৃথিবীকে বেশি করে জয় করবার ব্যাপারে ওদের মাথাব্যথাটা নেহাতই কম।

যেমন ধরো, চাকা-ওয়ালা গাড়ির কথা। বিশ জন মানুষ পালকি কাঁধে বইবে, না চাকা-ওয়ালা গাড়ি পোষা জানোয়ার দিয়ে টানানো হবে? যদি চাকা-ওয়ালা গাড়ির চলন হয় তাহলে যাদের কাঁধে পালকি বইবার দায় তারা রেহাই পায়, আর তাদের মেহনতটা পৃথিবীকে আরো বেশি করে জয় করবার কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ, চাকা-ওয়ালা গাড়ির চলন হওয়াটা পৃথিবীকে অনেক বেশি করে জয় করবার ব্যাপার। কিন্তু মালিকদের মাথায় একথা আসতে চায় না। তাই, প্রাচীন মিশরের যারা মহাপ্রভু ছিলো তাদের পক্ষে এই কথাটা ভেবে দেখবার দরকার পড়ে নি। সেই জন্যেই মানুষ চাকা-ওয়ালা গাড়ি তৈরি করতে শেখবার হাজার বছর পরে মিশর দেশে চালু হলো এই ধরনের গাড়ি। পৃথিবীকে জয় করবার কাজ কী রকম ভাবে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা তা বুঝতেই পারছো।

মালিক-প্রভুরা বরাবরই ওই রকম। পৃথিবীকে বদল করার উৎসাহ নেই, বরং বদলকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টাই। মানুষ যখনই পৃথিবীকে নতুন নতুন ভাবে জয় করবার নতুন নতুন

উপায় বের করেছে, মালিকের দল সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন বাধা। কখনো বা জিত হয়েছে মালিকের। পৃথিবীকে বেশি করে, ভালো করে, জয় করবার পথ আবিষ্কার করা গেলেও মানুষ এগুতে পারে নি সেই পথে। কাজে আসে নি মানুষের আবিষ্কার। আবার কখনো-বা হার হয়েছে মালিকদের, নতুন আবিষ্কারকে প্রাণপণে বাধা দিয়ে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি মানুষের এগিয়ে চলায়, হার হয়েছে মালিকদের; নতুন আবিষ্কারের জোরে, নতুন হাতিয়ার হাতে মানুষের দল হটিয়ে দিয়েছে মালিকদের। মালিকদের হটিয়ে দেবার পর কখনো-বা শক্তি এসেছে মেহনতকারী মানুষদের হাতেই; কিন্তু বেশির ভাগ বেলাতেই শক্তিটা এসেছে নতুন এক ধরনের মালিকদের হাতে। এই যে নতুন ধরনের মালিক, এরা যখন দেখে মানুষ আরো নতুন, আরো ভালো, আরো আশ্চর্য ভাবে পৃথিবীকে জয় করবার পথ খুঁজে পেয়েছে তখন এদেরও বুক ভয়ে কেঁপে ওঠে। এরাও মরিয়ার মতো রুখে দাঁড়ায় নতুন আবিষ্কারের বিরুদ্ধে।

পৃথিবীকে বদল করার নামে মালিকদের আতঙ্ক। তাই ওদের দলের বড়ো বড়ো ডাকসাইটে পণ্ডিতেরা নানান রকম বুদ্ধির কসরত করে প্রমাণ করতে চায় বদল যা-কিছু তা মায়া, তা মিথ্যে! আসলে যা সত্যি তার মধ্যে বদল নেই। সত্য হলো অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত! কিন্তু মেহনতকারী মানুষের চোখে এই সব বুদ্ধির কসরত যতো ধাঁধাই লাগাক না কেন, তারা আসলে এই ধাপ্পাবাজিতে ভোলে নি। জনগণ যদি সত্যিই এই ধাপ্পাবাজিতে ভুলে যেতো, পৃথিবীকে বেশি করে, ভালো করে, বদল করবার তাগিদ যদি সত্যিই মুছে যেতো তাদের মন থেকে,কী সর্বনাশই হতো তাহলে! কিন্তু মেহনতকারী মানুষ মনে প্রাণে এই সব কথায় বিশ্বাস করে নি বলেই আজো মানুষের পক্ষে পৃথিবীকে নতুন করে গড়বার স্বপ্ন, পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনবার স্বপ্ন। সেই পৃথিবীতে শোষণ নেই, পরের মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস লুট করে নিজের ভাঁড়ার ভর্তি করবার কথা ওঠে না। সেই পৃথিবীতে লোভ নেই, হিংসে নেই, নেই রক্তারক্তি বাধাবার নেশা। সেই পৃথিবীতে মানুষ বাঁচবে মিলেমিশে, একসঙ্গে। দশের ভালোতেই একের ভালো, একের ভালোতেই দশের ভালো।

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আসবে, -জনগণের এই স্বপ্ন তার গানে, তার উপকথায়। শোষকের দল যে-গল্প সৃষ্টি করেছে, কিংবা যে-গল্পের সৃষ্টি হয়েছে শোষকদের খুশি করবার জন্যে সেগুলো অনেক শৌখিন। অন্য রকমের। সেগুলোয় আমোদ-প্রমোদর কথা, মালিকদের মন-যোগানো কথা। জনগণের সৃষ্ট গল্প সে-রকম নয়। দু-চারটে নমুনা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

ধরা যাক, একটা রূপকথার কথা। এক বীর দৈত্যপুরীতে বন্দী হয়ে রয়েছে, দৈত্যেরা তার মাথায় সোনার কাঠি ঠেকিয়ে তাকে যাদু করেছে, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। জনগণের আশা আর ইচ্ছে দিয়ে গড়া এই বীরটি! সোনার শক্তি যাদের হাতে তারা, অর্থাৎ দৈত্যের মতো মালিকেরা, তারা বন্দী করে রেখেছে। মালিকদের অনেক অনেক টাকা, সোনার শক্তিটাই তাদের আসল শক্তি, তাই সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বীরটিকে বন্দী করবার গল্প। কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরটা কাল বন্দী হয়ে থাকবে না, সেই বীরের ঘুম ভাঙবে

একদিন। ঘুম ভাঙাবে কে? শাক-কুড়ুনি মেয়ে। জনগণের একজন, মেহনতকারীদেরই একজন -বড়ো গরিব, শাক কুড়িয়ে দিন কাটায়। আর তারপর? বীরপুরুষের ঘুম ভাঙবার পর? ওই শাক-কুড়ুনি মেয়ের হাত ধরে সে দৌড়ে যাবে অনেক দূরে। সেখানে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে এক ডুব দিয়ে সে তুলে আনবে একটা ছোট্ট কৌটো। কৌটোটার মধ্যে দৈত্যদের প্রাণভোমরা লুকোনো। তারপর আঁচল পেতে ধরবে ওই শাক-কুড়ুনি মেয়ে, আর সেই আঁচলের মধ্যে পুরে বীরপুরুষ দলে মারবেএই প্রাণ-ভোমরাকে, আর দৈত্যপুরীর সমস্ত দৈত্য আছড়ে-পিছড়ে মরে যাবে। শেষ হবে শোষকদের দাপট। তারপর জনগণের আশা-ইচ্ছে দিয়ে গড়া সেই বীরপুরুষ ফিরে পাবে তার দেশ, সে-দেশে রাণী হবে ওই শাক-কুড়ুনি মেয়ে, আর সেই দেশে সমস্ত মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করবে। দৈত্যদের দাপট নেই, জল নেই মানুষের চোখে।

কিংবা, ওই কড়িগাছের গল্পটাই ধরো না। গাঁয়ের কাছেই একটা কড়িগাছ ছিলো। সুন্দর সুন্দর আর গোটা গোটা কড়ি ধরে গাছটা যেন ঝলমল করতো। তো সব সুন্দন সুন্দর কড়ি, কিন্তু গাঁয়ের মানুষ গাছটার কাছে ঘেঁসতে পারে না। কেননা, গাছটার মালিক হলো এক সাংঘাতিক বাঘ, সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত্তির ধরে গাছটার চারপাশে তার কড়া পাহারা। তার মানে? মানে, মানুষ আবিস্কার করছে ঐশ্বর্য, তবু সে-ঐশ্বর্যে মানুষের অধিকার নেই। অধিকারটা অপরের, সে-ই মালিক। তাই বাঘটার অমন কড়া পাহারাদারি। গাঁয়ের ছোটো ছোটোছেলেমেয়েরা দূর থেকে গাছটাকে দেখে, কাছে যাবার সাহস পায় না। কিন্তু বাঘ কি চিরকাল অমনভাবে গাছটাকে আগলে বসে থাকবে? জনগণের গল্পে বলে, না তা নয়। মালিকদের ওই মালিকানা একদিন শেষ হবে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য এসে পৌছোবে মানুষের হাতে, জনগণের হাতে। তাই রূপকথার গল্পে বলে, গাঁয়েরই একটি ছোট্ট মেয়ে একদিন এমন এক কাণ্ড করে বসবে যার ফলে ওই পাহারাদার বাঘের মুখটা ফুটন্ত ফ্যানে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। মরে যাবে বাঘ। শেষ হবে তার পাহারাদারির পালা। আর কড়িগাছটা আসবে গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের দখলে। মালিকের দাপট শেষ। পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী।

এই তো রূপকথার গল্প। এই রকমের অনেক সব গল্প।

কে লিখলো এই সব গল্প? কেউ জানে না। আমি শুনেছি আমার ঠাকুমার মুখ থেকে, আমার ঠাকুমা শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুমার মুখ থেকে। আসলে, সত্যিইতো কোনো একজন লোক কোনো একদিন মাথা খাটিয়ে এইসব গল্প ফাঁদতে পারে নি। তাই এ-সব গল্প কবে লেখা তা কেউ জানে না। অনেক অনেক বছর ধরে অনেক অনেক আশা-আকাঙক্ষা এইসব গল্পে রূপ নিয়েছে। অনেক অনেক বছর ধরে অনেক অনেক মানুষ স্বপ্ন দেখেছে এই পৃথিবী বদলে গিয়ে নতুন এক পৃথিবী আসবে। সে-পৃথিবীই হলো আসল রূপকথার রাজ্য। সে-পৃথিবী প্রাচুর্যে টলমল, সেখানে জল নেই মানুষের চোখে, দাপট নেই দৈত্যের।

সেই পৃথিবীর স্বপ্ন। দুনিয়াকে বদল করবার স্বপ্ন। জনগণের মন থেকেও যদি নিভে যেতো এই স্বপ্ন, যদি তারাও ভাবতো এই দুনিয়ার বদল নেই, এই দুনিয়াকে বদল করা যায় না, তাহলে থেমে যেতো মানুষের গল্প। কিন্তু জনগণ তা ভোলে নি। ওই নতুন পৃথিবীর

স্বপ্ন তার মনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর তাই দিনের পর দিন হাতের হাতিয়ার দিয়ে সে বদল করে চলেছে পৃথিবীকে।

থেমে যায় নি মানুষের গল্প। মানুষের গল্প থামবে না কোনোদিন।

পিরামিড আর মমির রহস্য

মানুষের সভ্যতার কথা তোলা যাক। প্রথমে সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতাগুলোর কথা, আর খুব পুরোনো সভ্যতার কথা বলতে গেলে প্রথম মনে পড়ে মিশরের কথা।

মিশর। প্রাচীন মিশর! নামটা শুনলেই মনের মধ্যে উঁকি দেয় কতো অজস্র কথা। কতো রহস্য! কী ঐশ্বর্য!

মানুষের হাতে গড়া কতো অপরূপ, আশ্চর্য কীর্তি! মরুভূমির মরা বালির বুকে আকাশ ছোঁয়া পিরামিড, গুহার গোপনে হীরে-জহরতের ঝলকানি, আর ছ-হাজার বছর আগে মরে-যাওয়া মানুষের শরীর এখনো পর্যন্ত ফিতে জড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে -ওগুলোর নাম বুঝি 'মমি', ফিতেগুলোকে বুঝি বলে প্যাপিরাস, ফিতেগুলোয় ছোটো ছোটো ছবি আঁকা, -ছবিগুলো নাকি ছবি নয়, আসলে লেখার হরফ।

কেমন করে গড়ে উঠলো এই সভ্যতা?

মিশরে একটা নদী আছে, তার নাম নীল নদ। গরম কালের কড়া রোদে দূর পাহাড়ের চুড়োয় বরফ গলে যায়, গলা বরফের জল বন্যা হয়ে নেমে আসে নীল নদ দিয়ে, ভেসে যায় কিনারার জমিগুলো। তারপর, বন্যার জল সরে গেলে দেখা যায় কিনারার জমিগুলোর ওপর পুরু পলি পড়েছে। বড়ো উর্বর এই সব পলিপড়া জমি, এখানে যেন না চাইতেই পাওয়া যায় অনেক ফসল। এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করলো প্রাচীন কালের নানারকম যাযাবর

মানুষের দল, আর তাই তারা আস্তানা গাড়তে শুরু করলো নীল নদের কিনারায় কিনারায়। তারা কেউ-বা এসেছিলো আফ্রিকার দিক থেকে, কেউ-বা এসেছিলো আরব্য অঞ্চল থেকে, আবার এশিয়ার নানান জায়গা থেকে এসেছিলো নানান দল। একই জায়াগায় আস্তানা গাড়বার পর এই সব নানান দলের মানুষের মধ্যে মিশেল হয়ে যেতে লাগলো আর শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকার মিলে একটাই নাম হয়ে দাঁড়ালো। সে-নামটা হলো রেমি। রেমি মানে মানুষ।

চাষ-আবাদের জন্যে তারা জমিতে লাঙল দিতে শিখলো, শিখলো নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখতে, শিখলো খাল কেটে কেটে নানান জমিতে এই জল সরবরাহ করতে। মানুষ শিখলো ভালো করে চাষ বাদ করতে। কিন্তু ভালো করে চাষবাস করবার জন্যে যে-সব নতুন হাতিয়ার মানুষ তৈরি করলো সেগুলো দিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে চাষ করা চলে না। তাই শুরু হলো জমিজমা ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সব জমি তো সমান নয়; তাই কারুর ভাগে পড়লো ভালো জমি, কারুর ভাগে খারাপ জমি। তাছাড়া, সবাইকার সংসারে সমান লোক নয়, কারুর সংসারে বেশি, কারুর সংসারে কম। তাই যাদের জুটলো ভালো জমি আর যাদের সংসারে বেশি লোক তারা দিনের পর দিন দারুণ বড়োলোক হয়ে উঠতে লাগলো। আবার যাদের ভাগে পড়লো বাজে জমি আর যাদের সংসারে লোকবল কম তারা নেহাতই গরিব লোক হয়ে পড়তে লাগলো। এই সব গরিব লোকদের ডাক দিয়ে বড়োলোকরা বললো ঃ অতো মেহনত করে তো মরছো, কিন্তু দুবেলা পেট ভরে খেতে পারছো না; তার চেয়ে আমাদের জমিতে এসে গতর খাটাও, তোমাদের পেট ভরে খেতে দেবো। এ-ব্যবস্থায় বড়োলোকদের যে কতোখানি লাভ তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তাদের জমিগুলো ভালো জমি, সে-জমিতে গতর খাটিয়ে একজন লোক অনেকখানি বাড়তি জিনিস তৈরি করতে পারে, -বাড়তি জিনিস মানে হলো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যতোটা দরকার তার চেয়ে বেশি। এই বাড়তি জিনিসটুকু বড়োলোকদের সম্পত্তি হয়ে যাবে; সেই তাদের লাভ। অবশ্য, নিজেদের দলের গরিব লোক ছাড়াও বড়োলোকেরা বাইরের থেকেও ক্রীতদাস জোগাড় করতে কসুর করতো না। এইভাবে বড়োলোকরা আস্তে আস্তে জমিদার হয়ে উঠতে লাগলো, জমিদারদের মধ্যে থেকে হোমরাও-চোমরাও মহারাজা-টহারাজা।

মিশরের যে-রাজা তার উপাধি হলো ফেয়ারাও। তার ঘরে সম্পত্তির পাহাড়– কতো, ঐশ্বর্য, কতো হীরে-জহরত তা ভাবতে আমাদের মুখ হাঁ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়। সারা জীবন অমন অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেও তাদের যেন আশ মেটে না। মরে যাবার পরও তাদের ফুর্তি চাই। তাই মরে যাবার পরও শরীরটাকে কেমন করে টিকিয়ে রাখা যায় তার একটা উপায় বের হলো ঃ মৃতদেহটাকে কয়েক সপ্তাহ এক রকম আরকে ভিজিয়ে রেখে তার মধ্যে গলা 'পিচ' ভরে দেওয়া, –আজকালকার শহরে রাস্তাঘাট যে-রকম পিচ দিয়ে তৈরি হয় সেই রকম 'পিচ'ই। জিনিসটাকে ফরাসী ভাষায় বলে মমিয়াই, তার থেকে ওই রকম মৃতদেহের নাম হয়েছে মমি। ওইভাবে পিচ ঢালবার পর মৃতদেহটার সারা গায়ে ফিতে জড়িয়ে একটা কাঠের বাক্সর মধ্যে পুরে রাখা। অমনভাবে রাখলে সেটা আর গলে-পচে নষ্ট হয়ে যায় না, টিকে থাকে কয়েক হাজার বছর ধরে। শুধু তাই নয়। কবরখানার মধ্যেও হরেক রকম ফুর্তি আর তোয়াজের বন্দোবস্ত। বড়োলোকদের জন্যে বিরাট বিরাট

কবরখানা তৈরি হতো, সেই সব কবরগুলোরই নাম হলো পিরামিড। মরে যাবার পর থাকবার জন্যে ঘর। কিন্তু তার মধ্যে ষোলো আনা আয়েসের আয়োজন তো চাই! তাই কবরখানাগুলোর মধ্যে থরে থরে নানান জিনিস সাজিয়ে রাখা ঃ খাট-পালং, বাজনা-বাদ্যি, বাসন-কোসন, গয়না-গাঁটি, সব কিছুই। এমন কি, চাকর-বাকর, ধোপা-নাপিত চাই। কিন্তু তাই বলে জ্যান্ত ধোপা-নাপিত বা চাকর-বাকর তো কবরের মধ্যে সত্যিই পুরে রাখা যায় না। মরে গিয়ে গলে পচে পাঁক হয়ে যাবে। রাজারাজড়ারা তাই কবরের মধ্যে রাখতো পাথরের তৈরি ছোটো ছোটো চাকর-বাকরদের মূর্তি, আর তারা ভাবতো পাথরের তৈরি এই সব মূর্তিগুলো কবরের মধ্যেও তাদের তাঁবেদারি করবে।

অবশ্য, গরিব লোকদের বেলায় একেবারে অন্য কথা। তাদের মরা শরীরগুলোকে অমনভাবে টিকিয়ে রাখবার কথাই ওঠে না। পণ্ডিত আর পাণ্ডা-পুরুতের দল তাই তাদের সম্বন্ধে অন্য বিধান দিলো। বললো ঃ মৃত্যুর পর মানুষকে পশ্চিম দিকের পাহাড় পেরিয়ে অনেক দূরে এক জায়গায় যেতে হবে, সেখানে দেবতা অসিরিস্ বিচারে আসীন। যে-মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু মুখ বুজে খেটেছে, দেবতা অসিরিস্ খুশি হয়ে তাকে পোলাও-পায়েস খেতে দেবে; কিন্তু যে-লোক রুখে দাঁড়িয়েছে, মানে নি রাজাকে, মানে নি পুরুত-পাণ্ডাকে, দেবতা অসিরিস্ তাকে দেবে দারুণ কঠিন শাস্তি। মানুষের উচিত তাই শুধু মুখ বুজে মেহনত করা আর সেই মেহনত দিয়ে গড়া জিনিস পৌঁছে দেওয়া রাজারাজড়া আর পুরুত-পাণ্ডার ভাঁড়ারে।

দক্ষিণার পয়সা গুনে আর নৈবেদ্যর চাল-কলা জমিয়ে তখনকার দিনের পুরুত-পাণ্ডারাও নেহাত কম বড়োলোক হতো না, কেউ কেউ রীতিমতো পাল্লা দিতে পারতো স্বয়ং মহারাজার সঙ্গে -এতো বড়োলোক!

প্রাচীন মিশরকে চিনতে চাও? সত্যিকারের চিনতে চাও? তাহলে ভেবে দেখো সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা যাদের মেহনত দিয়ে তৈরি হয়েছিলো অমন আশ্চর্য ঐশ্বর্য, অমন সব চোখ-ধাঁধানো কীর্তি। তাদের খবর পাওয়া যায় ওদেশের খুব পুরোনো ছবিতে, এমন কি কিছু কিছু পুরোনো লেখাতেও। ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় সেই সব লক্ষ লক্ষ মানুষ ঃ রুক্ষ মরুভূমি, ধু-ধু রোদ, তার মধ্যে দিয়ে ওরা বিরাট বিরাট পাথর টেনে নিয়ে চলেছে, সেই পাথর দিয়ে গড়া হয়েছে পিরামিড। ছবিতে দেখবে, ওই সব হাজার হাজার মানুষ চলেছে রাজার জন্যে ভোগবিলাসের সম্ভার কাঁধে বয়ে, বোঝার ভারে তাদের পিঠগুলো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে, পেট ভরে খেতে পায় না বলে তাদের শরীরে হাড় আর চামড়ার মাঝখানে বিশেষ কিছু নেই। প্রাচীন মিশর! কতো ঐশ্বর্য! এ-সব ঐশ্বর্য তাদেরই হাত দিয়ে গড়া! অথচ, তাদের নিজেদের কপালে জুটেছিলো শুধু সেপাইদের চাবুক, বরকন্দাজের বল্লম, আর তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া!

মমিদের গায়ে জড়ানো ওই যে ফিতেগুলো, ওগুলোতেও খুদে খুদে ছবির অক্ষরে অনেক কথা লেখা আছে; সেই লেখা থেকে খানিকটা বাংলা করে তুলে দিই, আন্দাজ করতে পারবে যারা মেহনত করতো তখন তাদের দশাটা কী রকম ছিলো। এক জায়গায় লেখা আছে ঃ

-কামারকে দেখেছি কামারশালে কাজ করতে। আগুনের মুখে হাফর নিয়ে সে দিনরাত বসে রয়েছে, ওই রকম ভাবে দিনের পর দিন একটানা বসে থাকতে থাকতে তার গায়ে পচা আর আঁশটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে। ...খোদাইকর সমস্ত দিন ধরে কঠিন পাথর কেটে চলেছে, তারপর দিনের শেষে যখন আর তার হাত দুটো নেহাতই চলতে চায় না তখন হয়তো সারা দিনের মজুরি বাবদ দু-টুকরো রুটি জুটলো। কিন্তু পরের দিন সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে যদি আবার কাজে না লাগে তাহলে তার হাত দুটো পিঠের দিকে শক্ত করে বেঁধে...। রাজমিস্ত্রির কথা বলবো? পরনের কাপড় বলতে তার কোমরে শুধু এক টুকরো নেঙটি, কাজ করতে করতে তার আঙুলগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে; কিন্তু তার যদি খিদে অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে নিজের আঙুলগুলো কামড়ানো ছাড়া তার আর কোনো গতি থাকে না। ...হাঁটু দুটো বুকে দুমড়ে সমস্ত দিন তাঁত বুনছে তাঁতি ...কখনো যদি সূর্যের আলো দেখবার জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করে তাহলে দোরের পাহারাদারকে নিজের রুটির টুকরোটুকু ঘুষ দিতে হবে...। ...মুচি যেন সমস্ত দিন ধরে কাতরাচ্ছে, পেটের জ্বালা যদি অসহ্য হয় তাহলে চামড়ায় দাঁত ফোটানো ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই।...

নীল নদের ধারে মানুষের যে প্রথম সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো এই হলো তার ভেতর দিককার আসল চেহারা! এ-চেহারাটা বড়ো নোংরা, বড়ো বিশ্রী। মানুষ অতো সভ্য হলো, পৃথিবীকে অতোখানি জয় করতে শিখলো; কিন্তু তারই উল্টো পিঠে দেখা গেলো মানুষের এই চরম অপমান, এই হেরে যাওয়ার দিক।

কিন্তু তাই বলে কি ভাবতে হবে, মিশরের ওই যে সভ্যতা ওর আসলে কোনো দাম নেই? তাও নয়। গর্ডন চাইল্ড বলে সম্প্রতিকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যাপারটা খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। মানুষের গল্পটা যতো সরল হলে আমরা খুশি হতাম আসলে তা সেরকম নয়। যদি একেবারে আদিম কালের সমানে-সমান অবস্থা থেকে— যাকে বলে আদিম সাম্যবাদ, তা থেকে- মানুষ একেবারে সোজা সড়ক ধরে আগামী কালের ঐশ্বর্যে ভরা সাম্যবাদ পর্যন্ত এগুতে পারতো তাহলে তো সত্যিই দারুণ খুশি হবার কথা হোতো। কিন্তু মানুষের এগুবার গল্পটা আসলে অমন সহজ সরল নয়। তার এগুবার পথটা খুবই জটিল।

প্রায়ই চোখে পড়ে আশ্চর্য কীর্তির ঠিক উল্টো পিঠে কুৎসিত শোষণ। প্রাচীন মিশরের কথাই আরো একটু খতিয়ে দেখা যাক। অনেকখানি এলাকা জুড়ে অনেক মানুষের উদ্বৃত্ত উৎপাদন যদি এক জায়গায় জড়ো করা সম্ভব না হতো তাহলে মানুষ সভ্যতার প্রথম ইমারতই গাঁথতে পারতো না। আর সভ্যতার ইমারত যদি একটা সময় শুরুই না-হতো তাহলে মানুষ সভ্যতার পথে ধাপে ধাপে এগুতেই পারতো না। সেদিক থেকে দেখলে প্রাচীন মিশরের কীর্তি সত্যিই পরমাশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু তারই উল্টো পিঠটা তেমনি নোংরা, তেমনি ঘৃণ্য। অনেক মানুষকে মরতে হয়েছে, অনেক মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। তার মূল্য চোকাতে পেরেছে বলেই মানুষ সভ্যতার আঙিনায় প্রথম পৌঁছতে পারলো। নইলে আটকে থাকতে হোতো অসভ্য অবস্থাতেই। অতোখানি মূল্য চোকাতে না হলে আমরা নিশ্চয়ই দারুণ খুশি হতাম। কিন্তু, পণ্ডিতি ভাষায়- মানুষের

অগ্রগতি দ্বন্দ্বমূলক। সোজা কথায় তার দুটো দিক আছে এবং এই দুটো দিকের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত। এই সংঘাত বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে এগুবার খুব একটা সাদা-মাটা পথের কথা কবির কল্পনার মতো হতে পারতো! কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হতে পারতো না। মানুষের সত্যিকারের গল্প যদি বুঝতে চাও তাহলে এই দুদিকের মধ্যে সংঘাতটা ভুললে চলবে না।

তাই মিশরের ওই সভ্যতা মানুষের ইতিহাসে যে-সব আশ্চর্য ঐশ্বর্য দিয়ে গিয়েছে তার কথাও ভোলা চলবে না। আর সে-ঐশ্বর্য বলতে শুধুই রাজা-রাজড়ার হীরে-জহরত নয়। কৃষিবিজ্ঞানের দিক থেকে- অর্থাৎ কি না, চাষবাস করবার কায়দাকানুনের ব্যাপারে- মিশরের সভ্যতা মানুষকে কী আশ্চর্যভাবেই না এগিয়ে নিয়ে গেলো! তাছাড়া, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি —আরো কতো রকম। ক্রীতদাসদের ওই বুকফাটা কান্নার কথা ভাবতে ভাবতে এই দিকগুলো সম্বন্ধে খেয়াল হারালেও চলবে না।

তবে ক্রীতদাসরা তো শুধুই কাঁদে নি। তাদের মেহনত নির্মমভাবে লুঠ করা হতো; কিন্তু তারা শুধুই মুখ বুজে তা সহ্য করে নি। শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ওরাও দল বেঁধেছে, রুখে দাড়িয়েছে, —অনেক বার। আর তাদের এই বিদ্রোহে এমন কি ধুলো হয়ে গিয়েছে নানান রাজার রাজত্বও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের জিত অবশ্য হয় নি। পুরোনো শোষকদের ওরা মাঝে মাঝে হটিয়ে দিতে পারলেও তার জায়গা জুড়ে বসেছে নতুন শোষকের দল। শোষণের পালা একেবারে শেষ করে দেবার মতো অবস্থা তখন ছিলো না, সে-অবস্থা আজকের দিনে আজকের পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিত হয়নি বলে, - শোষণের পালা শেষ হয়নি বলে, ক্রীতদাসদের ওই বিদ্রোহকে তুচ্ছ করতে যাওয়াও চলবে না। কেননা, ওই বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষের শক্তির কথা। তারা দল বেঁধে এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে, আর যখন রুখে দাঁড়ায় তখন দুর্বার হয়ে ওঠে তাদের শক্তি। সিপাই-শাস্ত্রী, পাইক-পেয়াদা —কিছু দিয়েই তা আর রোখা যায় না, অন্তত সাময়িকভাবে তো নয়ই। কিন্তু প্রাচীন মিশরে এ-জাতীয় বিপ্লব সফল হয়নি; রাজার দাপটে শেষ পর্যন্ত হার মেনে যায়।

সিন্ধু আর গঙ্গার কিনারায়

যাঁরা মাটি খুঁড়ে পুরোনো কালের রকমারি নজির বের করেন তাঁদের বলে প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদেরই এক প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৮৮৫, মৃত্যু ১৯৩০। ১৯২১ সালে তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। সিন্ধু প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড ঢিবি ছিলো। আজকাল লোকে তাকে বলে মোহেঞ্জোদাড়ো, মানে মৃতের স্তূপ ধরনের একটা কিছু। ১৯২১ সালে বাঁড়ুজ্জেমশাই করলেন কি, দলবল লাগিয়ে কোদাল-গাঁইতি দিয়ে এই ঢিবিটা খুঁড়তে শুরু করলেন। ঢিবি থেকে বেরুতে শুরু করলো নানান আশ্চর্য জিনিস। আর সেগুলো থেকেই প্রমাণ হলো, আমাদের দেশের মানুষের গল্পটা একেবারে নতুন করে বুঝতে হবে; এ-বিষয়ে সাবেকী ধারণা যেন মিশমার হয়ে গেলো।

ব্যাপারটা একটু খতিয়ে বুঝতে হবে।

আমাদের সবচেয়ে পুরোনো সাহিত্যের নাম বেদ। বিশাল সাহিত্য। তার মধ্যে যেটা প্রধান আর সবচেয়ে পুরোনো তার নাম ঋগ্বেদ। যারা বেদ রচনা করেছিলেন তারা কিন্তু তখনো লিখতে শেখেননি - অর্থাৎ, তারা তখনো লেখার হরফ আবিস্কার করেননি। মুখে মুখে গান আর স্তব রচনা করতেন। আজো আমাদের দেশে নানা আদিবাসীরা যেমন মুখেমুখে ছড়া বাঁধেন, গান রচনা করেন। কিন্তু লিখতে না-শিখলেও যুদ্ধ করতে দারুণ ওস্তাদ। সাধারণত ধরা হয় খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগে এদের দল হিন্দুকুশ হয়ে হিমালয় পেরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকটা দখল করলো। এরা নিজেদের বলতেন আর্য আর যাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেশের ওই অংশটা দখল করলেন তাদের সাধারণত বলতেন দাস। এর থেকে নানা পণ্ডিত এদের নাম দেন আর্যজাতি। কিন্তু তাদের সেই মত ধোপে টেকেনি। আর্য বলতে আসলে কোন জাতি বোঝায় না, একজাতের ভাষাকে আর্যভাষা বলা যায় –এই ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর আরো নানা ভাষার মিল থেকে ভাষাটাকে বরং ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা বলা হয়।

বাঁড়ুজ্জেমশায় মোহেঞ্জোদাড়ো খুঁড়তে শুরু করার আগে পর্যন্ত যারা ইতিহাস লেখেন তাদের ধারণায়, ওই বেদ থেকেই ভারতের ইতিহাস শুরু; কেননা ভারতে এর চেয়ে পুরোনো ইতিহাসের কোনো নজিরই তখনো জানা ছিলো না। কিন্তু ঢিবি খুঁড়ে রাখালদাস যে-সব নজির আবিস্কার করলেন তা থেকে প্রমাণ হলো ওই আর্যভাষীরা এ দেশ আক্রমণ করবার ঢের ঢের আগেই সিন্ধু উপত্যকায় এক পরমাশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। সে-সভ্যতায় পোড়া ইটের তৈরি ইমারৎ, বিশাল গোলাঘর, সাধারণের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নানা নর্দমা তৈরির কায়দা যতোই জানতে পারা গেলো ততোই তো পণ্ডিতদের চক্ষু চড়ক গাছ! প্রাচীন মিশরের (আর প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার) মতোই পুরোনো সেই সভ্যতা; কারিগরির দিক থেকে আরো চোখ ঝলসানো তার কথা।

প্রাচীন কালে এ-হেন আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে উঠলো কেমন করে? কারা গড়লো? এ সব প্রশ্ন নিয়ে মহাপণ্ডিতদের মধ্যে তর্কাতর্কির অবধি নেই; মোটা মোটা ঢের বই লেখা হয়েছে। সে-সব অলিগলিতে ঢুকতে গেলে আমাদের গল্পের খেই হারিয়ে যাবার ভয়। কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে। প্রায় ৫০০,০০০ বর্গমাইল ধরে এই সভ্যতার নানা স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে; খুঁজে পাওয়া গেছে ছোটো বড়ো নানা নগর; এমনকি একটা আশ্চর্য বন্দর; তার নাম লোথাল। এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম রফিক মুঘল বলে পাকিস্তানের একজন খুব নাম করা প্রত্নতত্ত্ববিদ আরো দুটো নতুন নগরের চিহ্ন মাটি খুঁড়ে বের করেছেন; তার মধ্যে একটা তো রীতিমতো লম্বাই-চওড়াই। যাই হোক, এই সভ্যতার আরো কত পরিচয় পাওয়া যাবে তা এখুনি কেউ জোর করে বলতে পারেন না। তবে একটা কথা বলতে বাধা নেই।

অমন জাঁকালো একটা সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে কতো কারিগর লাগবার কথা তার হিসেব করা দায়। নিশ্চয়ই হাজার কারিগর –অনেক অনেক হাজার। তাদের তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। কিন্তু তারা নিজেরা যদি চাষবাস করে নিজেদের পেট চালাবার মতো খাবার তৈরি করতে বাধ্য হয় তাহলে আর কারিগরির জন্যে পুরো সময় দিতে পারবে না। তাই তাদের পেট ভরাবার জন্যে আশপাশের –এমনকি হয়তো বেশ কিছুটা দূরদূরান্তরের কৃষকদের ফলানো ফসল জোগাড় করা দরকার। কিন্তু জোগাড়টা হবে কী করে? তার জন্যে

লুটপাটের দরকার। কিন্তু এর চেয়ে ঢের সহজ একটা উপায়ও বের করা গেলো। গড়ন্ত নগরগুলোয় বড়ো বড়ো দেবালয় তৈরি হলো, তারাই নাকি নগরগুলোর আসল অধিপতি বা মালিক। আর যে-কোনো ভাবেই হোক না কেন, চাষীদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো নিজেদের তৈরি ফসলের একটা অংশ এ-সব দেবতাদের কাছে পৌঁছে না-দিলে দারুণ সর্বনাশের ভয়। হয়তো ওই দেবদেবীর রাগে মহামারিতে গ্রামকে গ্রাম উজোড় হয়ে যাবে; হয়তো আসছে বছর অনাবৃষ্টিতে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে —ফসলই ফলবে না। কথাটা চাষীদের মাথায় ঢোকাতে পারার ফলে তারাই ঘাড়ে করে নিজেদের তৈরি ফসলের একটা অংশ গড়ন্ত নগরগুলির দেবালয়ে পৌঁছে দিতে শুরু করলো। ভরে উঠতে লাগলো নগরের বড়ো বড়ো খামারগুলো। কারিগরদের নিছক পেট চালাবার জন্যে যতোটা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই বেশি অংশটার গতি কী হলো?

আকাশ থেকে মোহেঞ্জোদাড়োর ছবি।

অবশ্য মানুষের কল্পনার বাইরে দেবদেবীদের তো সত্যি কোনো ডেরা নেই। কিন্তু দেবদেবীদের প্রতিনিধি হিসাবে যারা জাঁকিয়ে বসতে শুরু করলো তারা নেহাতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাদেরই বলে পাণ্ডা পুরুত। দেবদেবীদের মনের কথাটা শুধু নাকি তারাই জানে। দেবদেবীদের কী করে তোয়াজে রাখতে হয় তার মন্তরতন্তর তো আর কারুর জানার কথা নয়। তাই দেবদেবীদের নামে দেওয়া ফসলটার উপর তাদেরই আসল দখল। তাদের ধনরত্ন দিনের পর দিন ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগলো। এদের দলে খুব সম্ভব ভিড়ে গেলো যুদ্ধ-নেতাদের দল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার সবটা খবর আমাদের সত্যিই এখনো জানা নেই। এটুকু জানা আছে যে প্রাচীন সিন্ধুবাসীরা লিপি আবিস্কার করেছিলো। তারা লিখতে শিখেছিলো। ওদের অনেক লেখা উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এখনো পড়া যায়নি। পড়া যেদিন সম্ভব হবে - যদি অবশ্য একান্তই তা সম্ভব হয়-তাহলে হয়তো ওদের কথা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সিন্ধু উপত্যকা আর তার চার পাশের মাটি খুঁড়ে ওই প্রাচীন সভ্যতার অনেক আশ্চর্য কীর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। সে সব দেখে আজো আমাদের তাক লেগে যায়। কিন্তু তখনকার দিনের সাধারণ মানুষগুলোর খবর কী? তাদের কথা সরাসরি জানবার বিশেষ কোনো উপায় নেই। তবে নিশ্চয়ই আন্দাজ করা যায় তাদের দশাও প্রাচীন মিশরের সাধারণ খেটে-খাওয়া লোকদের চেয়ে বড়ো একটা ভালো ছিলো না। দুমুঠো খাবার জুটতো। কিন্তু তার চেয়ে খুব একটা বেশি কিছু নয়। অথচ তাদেরই রক্ত জল করা খাটুনির পর অমন আশ্চর্য সভ্যতার ইমারৎ!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশ্চর্য সভ্যতারই-বা হলো কী? সভ্যতার প্রাণশক্তি নিশ্চয়ই কমে আসছিলো; পাণ্ডা পুরুতদের দাপটে সব সভ্যতারই প্রাণশক্তি কমে আসবার কথা। পৃথিবীর নিয়মকানুন ভালো করে জেনে এবং সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পৃথিবীকে আরো বেশি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা থেকেই মানুষের এগিয়ে চলার প্রেরণা। তারই নাম বিজ্ঞান। কিন্তু পুরো সমাজটা দেবদেবীর পার্থিব প্রতিনিধি পাণ্ডা পুরুতদের কবলে পড়লে? অবস্থাটা তখন একেবারে বদলে যায়। কেননা, পৃথিবীকে যতো ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা, ততোই ওই কল্পিত দেবদেবীদের নির্বাসনের আশঙ্কা। ঝড়-বৃষ্টি সত্যিই কেন হয় - এই কথা মানুষ যতো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে শেখে ততোই ঝড়ের দেবতা বা বৃষ্টির দেবতার বিদায়ের পালা। আর তাই হলে দেবদেবীদের পার্থিব প্রতিনিধিদেরও বাড়া ভাতে হাত পড়ে; খুব সহজে কল্পিত দেবদেবীর কথা দিয়ে মানুষকে তাঁবে রাখা আর সম্ভব হয় না। তাই কোনো একটা সভ্যতার আর নিজস্ব প্রাণশক্তি বাকী থাকে না; পৃথিবীকে আরো ভালো করে জেনে আরো বেশি দখলে আনবার চেষ্টা শেষ হয়ে আসে। তাই এমন কথা ভাববার নিশ্চয়ই সুযোগ আছে যে পুরোহিত শাসিত ওই সিন্ধু সভ্যতা ক্রমশ নিস্প্রাণ হয়ে আসছিলো।

অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে মহাপণ্ডিতদের মধ্যেও ঝগড়াঝাটির যেন শেষ নেই। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সভ্যতাটা খতম হয়ে এলো। কারুর মতে আবার ম্যালেরিয়া-মহামারির চোটে মানুষগুলো মরতে শুরু করলো। আবার কারুর মতে পুরোহিত শাসনের ফলে সভ্যতার প্রাণশক্তি যখন শুকিয়ে আসছে সেই সময় যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার শেষ হয়ে গেলো! অবশ্যই বেদ হিন্দুদের কাছে পরের যুগে অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ; তাই যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের উপর অমন একটা অপবাদ দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মধ্যে মহা আপত্তি। কিন্তু ঋগ্বেদের অনেক গানে খুব ঘটা করে বর্ণনা করা হয়েছে, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধবাজ - যার নাম ইন্দ্র –ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নানান নগর ধ্বংস করেছেন। ওই অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতা ছাড়া আর কোনো সভ্যতার নগর নিশ্চয়ই ছিলো না। তাই আর্য ভাষাভাষী বৈদিক মানুষদের আক্রমণের কথাটা উড়িয়ে দেওয়া সত্যিই সহজ নয়।

কিন্তু এই নিয়ে তর্কের ধূমধাম চলছে। চলবে। তার মধ্যে নাক গলাতে গেলে মানুষের গল্পটা দারুণ রকম আটকে যাবার কথা। আমাদের পক্ষে তর্কাতর্কির ধুলো-ঝড় এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই ভালো। তার বদলে বরং যারা বেদ রচনা করেছিলেন তাদের কথা কিছুটা তোলা যাক।

বেদ-এর মধ্যে সেরা বলতে ঋগ্বেদ। তাই নিয়ে সাধারণের মধ্যে এমন প্রকট একটা ভয় ভক্তির ভাব প্রচার করা হয়েছে যে অনেকেই পড়ে দেখবার সাহস পাননা। তবুও সাহিত্য হিসেবে তার দাম সত্যিই প্রায় অতুলনীয়। খ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় দেড় হাজার বা আরো বেশি বছর আগে আর্য ভাষাভাষীরা অমন অজস্র আর আশ্চর্য গান আর কবিতা কী করে রচনা করলেন তা ভাবতে আজো আশ্চর্য লাগে; আরো আশ্চর্য লাগে অমন অপরূপ সাহিত্য কৌশলের সঙ্গে রণ কৌশলের আশ্চর্য সম্পর্কটা ভাবতে। যারা এসব গান রচনা করেছিলেন তাদের আসল পরিচয় আমরা খুব কিছু জানি না। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে হাজারের চেয়ে বেশি অতো গান রাতারাতি রচনার কথা ওঠেনা। অনেক দিন ধরে অনেক কবির অনেক রচনার সংকলন এই ঋগ্বেদ। পরের যুগে একে অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে যতোই জোর গলায় প্রচার করা হোক না কেন, ঋগ্বেদের পুরোনো গানগুলির মধ্যে ধর্মে গদগদ হয়ে পড়বার মতো সত্যিই কিছু নেই। অবশ্যই অজস্র দেবতার কথা আছে; দেবী তুলনায় খুব কম। কিন্তু দেবতা বলতে এখনকার লোক আর পরের যুগের লোক নিশ্চয়ই একই কথা বুঝতেন না। ঋগ্বেদের পুরোনো গানগুলিতে দেখি দেবতায় আর মানুষে রীতিমতো গলায় গলায় ভাবসাব, একসঙ্গে বসে মজা করে সোমরস (সেকালের মদ) পান করছেন, মেতে উঠছেন যৌথ জীবনের কল্যাণ কামনায়। আসলে যারা ঋগ্বেদ রচনা করেছিলেন তারা ছিলেন মূলতই পশুপালক –ঘর বাড়ি তৈরির বদলে গোরু চরাতে চরাতে ক্রমশই ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসেন, আর যতোই এগোন ততোই স্থানীয়

আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিশেল হতে থাকে। শুরুতে তারা চাষবাস জানতেন। খুব সম্ভব তাদের কাছ থেকেই বৈদিক মানুষরা চাষবাস ভালো করে শেখেন।

আমরা আগেই দেখেছি, পৃথিবীকে জয় করবার কায়দা যথেষ্ট উন্নত না-হওয়া পর্যন্ত মানুষের যে-সমাজ তাকে আদিম সাম্য-সমাজ বলতে হবে। সকলেই সমান, কেননা সকলেই প্রাণপাত করে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটুকু আদায় করতে পারে তাই দিয়ে বড়ো জোর নিজেদের বাঁচবার ব্যবস্থা হয়। তার বেশি কিছু থাকে না। ফলে একের কবলে বাকি দশের মেহনতের ফল জমবার কথা ওঠে না। ঋগ্বেদের প্রাচীন গানগুলিতে এই রকমই এক প্রাচীন সাম্য-সমাজের ছবি; বা অন্তত তার স্মৃতিতে গানগুলি ভরপুর।

কিন্তু সেই সমাজে ক্রমশই ফাটল ধরলো। লুটপাট করে স্থানীয় লোকদের ধনরত্ন কাড়তে পারা নিশ্চয়ই তার একটা কারণ। যতো লুঠ ততো সম্পদের সঞ্চয়। আর একটা কারণ, নিশ্চয়ই বৈদিক লোকদেরই হাতিয়ার আর তারই সঙ্গে মেহনত করবার কায়দার উন্নতি। আদিম কালের সাম্য-সমাজ ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিলো নতুন ধরনের সমাজ। ঘটনাটা নিশ্চয়ই রাতারাতি ঘটেনি; ঘটতে অনেক শো বছর সময় লেগেছিলো। তবু শেষ পর্যন্ত ঘটলো; আর এই যে নতুন সমাজের গড়ন তা থেকে আমরা আজো মুক্তি পাইনি, মুক্তির পথ খুঁজছি।

ঋগ্বেদের ঢের ঢের পরে একরকমের আইনের বই লেখা হলো। তার নাম ধর্মশাস্ত্র। বেদ-এরই দোহাই দিয়ে লেখা; কিন্তু ঋগ্বেদের সঙ্গে সত্যি কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া দুস্কর। যাই হোক, এই আইনের বইগুলি অনুসারে সমাজে মোটের উপর চার রকম মানুষ থাকবে; এক এক রকম মানুষকে বলে এক এক বর্ণের লোক। এই চার বলতে ঃ ১. ক্ষত্রিয় বা রাজারাজড়া–তারা লুটপাট করবে, যুদ্ধ করবে, কেড়ে আনবে অপরের তৈরি সম্পদ। ২. ব্রাহ্মণ–তারা যাগযজ্ঞ করবে আর তার জন্যে মোটা দক্ষিণা আদায় করে নিজেদের ভাঁড়ার ভরাবে। ৩. বৈশ্য-এরা চাষবাস আর ব্যবসা বাণিজ্য করে যতোটা পারে কামাবে। এই তিন হলো, উঁচু জাতের বা উঁচু বর্ণের মানুষ। বাকিরা–যারা কিনা সমাজটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মেহনতের সবটা দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে-তাদের এক কথায় বলে দেওয়া হলো– ৪. শূদ্র। ক্ষেত খামারের কাজ থেকে সব রকম মেহনতের দায়িত্ব এদেরই উপর। কিন্তু পাছে এরা উদ্ধত হবার উপক্রম করে সেই ভয়ে আইনকর্তারা আদেশ দিলেন - এদের দেওয়া হবে শুধুমাত্র জীর্ণ বসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, আর শোবার জন্যে বড়ো জোর ছেঁড়া-খোঁড়া ফেলে দেওয়া মাদুর। আইনকারেরা আরো আদেশ দিয়েছেন, ধন লাভে সমর্থ হলেও শূদ্ররা তা করতে পারবে না; কেননা শূদ্রর হাতে ধন-সম্পত্তি দেখলে ব্রাহ্মণের মনে বড়ো কষ্ট হয়। মতটা একটু পোক্ত করার আশায় আমাদের দেশের নামজাদা দার্শনিক শঙ্করাচার্য বলছেন, শোক থেকে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ কিনা, চোখের জলই ওদের একমাত্র সম্বল।

মনু বলে আইনকার বলেছেন, উঁচু বর্ণের লোকদের দাসত্ব করা ছাড়া শূদ্রর আর কোনো অধিকার থাকতে পারে না; কেননা স্বয়ং ভগবান শুধুমাত্র দাসত্ব করবার জন্যে এ-হেন আধা-মানুষ-আধা-জানোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন।

এই হলো আমাদের শাস্ত্রের আদর্শ সমাজ। অন্যান্য দেশের মতোই চরম শোষণের আদর্শে গড়া এক সমাজকে আমাদের দেশের মানুষ প্রায় দুহাজার বছর ধরে মাথা পেতে নিয়েছে! এই অবস্থা আর কতোদিন চলবে? উত্তরটা নির্ভর করছে তোমার উপর, আমার উপর, আমাদের সকলের উপর। মানুষের গল্প শুধু শোনবার ব্যাপার নয়; সৃষ্টির ব্যাপারও।

গ্রীসের গৌরব

প্রাচীন গ্রীস। কী অপরূপ গৌরবের সভ্যতা। গ্রীকদের কীর্তিকলাপের কথা বুঝি শতমুখে বলেও ফুরোয় না। ছেনি আর হাতুড়ি হাতে সাদা পাথরের বুকে ওরা যেন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারতো, এমনই আশ্চর্য ওদের মূর্তি গড়বার কায়দা। ওদের লেখা কবিতার বই আর নাটক পড়তে পড়তে আজকের দিনের মানুষও মুগ্ধ হয়ে যায়, ওদের লেখা জ্ঞানের কথা পড়তে পড়তে আজকের দিনের পণ্ডিতরাও অবাক হয়ে যান। আর বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের বেলাতেও ওদের জুড়িদার খুব কমই হয়েছে।

এদিকে যুদ্ধ বলো, রাজনীতি বলো, ব্যবসা বলো, বাণিজ্য বলো, -কোথাও ওরা পিছ-পা ছিলো না। যুদ্ধে ওরা ট্রয়কে হারিয়ে প্রায় একেবারে শেষ করে দিয়েছিলো, পারস্য দেশ থেকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর ঢেউ ওদের ওপর বারবার আছড়ে পড়েছে, তবুও হটাতে পারে নি ওদের। সওদাগরিতেই বা ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? ওদের সওদাগররা বড়ো বড়ো নৌকায় পাল খাটিয়ে কতো দূর-দেশ পর্যন্তই না পাড়ি দিতে পারতো! আর রাজনীতি? গ্রীকরাই প্রথম দেখিয়ে দিলো রাজাকে বাদ দিয়েও কেমন করে রাজত্ব চালানো যায়। গ্রীসের ছোটো ছোটো শহরগুলো কেমন করে শাসন করা হতো শুনলে অবাক হয়ে যাবে ঃ শহরের সমস্ত বাসিন্দা জমায়েত হতো মাঠে বা হাটবাজারের পাশে, আর সেখানে সবাই মিলে সাব্যস্ত করতো কেমন করে চালাতে হবে শহরটার শাসন। সাধারণ লোকের মত নিয়ে দেশের কাজ চালানোকে বলে গণতন্ত্র; গ্রীসের ছোটো শহরগুলোতেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গণতন্ত্রের পরিচয়।

অথচ, দেশটা সত্যিই এমন কিছু সুজলা-সুফলা নয়। বরং রুক্ষ অনুর্বর দেশ, পাহাড় আর পাথর আর কঠিন মাটি। তাই পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করবার দায়টা অনেক বেশি। নীল নদ কিংবা গঙ্গা আর সিন্ধুর কিনারায় সভ্যতা গড়বার জন্যে যতোখানি মেহনত দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি মেহনত দরকার পড়েছিলো গ্রীক সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে। আর যদি তাই হয় তাহলে ওরা অমন আশ্চর্য শিল্প,

অমন নাটক আর কবিতা, অমন গভীর জ্ঞানের চর্চায় এতোটা মন দিতে পারলো কেমন করে? কেমন করে ওরা সময় পেলো রাজনীতি নিয়ে অতো মাথা ঘামাবার, সাগর পাড়ি দিয়ে অমন সওদাগরি জমাবার, যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে অমন অসাধারণ ওস্তাদ হয়ে ওঠবার? অমন রুক্ষ দেশে নিছক বেঁচে থাকবার জন্যেই যতোটা মেহনত দরকার সেই মেহনত করতেই তো মুখে রক্ত ওঠবার কথা।

এইসব ভেবেচিন্তে অনেকে বলেন, ওরা—ওই গ্রীকরা—সত্যিই বুঝি এক সৃষ্টিছাড়া জাত ছিলো। তাই এমন রুক্ষ দেশের বাসিন্দা হয়েও সভ্যতার যেটা সবচেয়ে চোখ-ধাঁধানো দিক, সেই দিকে কতোই না মন দিতে পেরেছিলো!

হয়তো সত্যিই তাই। ওদের প্রতিভা সত্যিই ছিলো অসামান্য। কেননা, অমন রুক্ষ দেশের বাসিন্দা হয়েও ওরা এমন এক ব্যবস্থা করে নিয়েছিলো যার ফলে বাঁচবার জন্যে যে মেহনতের দায় তার একটুখানিও ওদের নিজেদের ঘাড়ে পড়লো না। ঘরকন্নার কাজ থেকে শুরু করে পশুপালন, হরেক রকম জিনিসপত্তর তৈরি করা আর এমন কি সেই জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে সওদাগরি করতে যাওয়া—কোনো কিছুর দায়ই ওরা নিজেরা ঘাড়ে নেয় নি। আর তাই অতো ঢালাও অবসর, সূক্ষ্ম আর শৌখিন ব্যাপারগুলোর দিকে অতোখানি মন দিতে পারা।

মেহনতের দায়টা তাহলে কাদের ঘাড়ে? অন্য একদল মানুষের ঘাড়ে। তারা গ্রীক নয়। তাদের নাম ক্রীতদাস। আর গ্রীকরা বলতো, ওরা - ওই ক্রীতদাসরা - ঠিক মানুষ নয়। কিংবা মানুষ দু-রকমের, এক হলো স্বাধীন গ্রীক আর এক হলো ক্রীতদাস। গ্রীকদের মধ্যে একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিতমশাই ছিলেন, তাঁর নাম অ্যারিস্টটল। তিনি বলতেন, ক্রীতদাসদের জন্মই হয়েছে গতর খাটাবার জন্যে, শুধু মুখ বুজে মেহনত করবার জন্যে। গ্রীকদের প্রতিভা সত্যিই অসামান্য ছিলো : কেননা ওদের আগে পর্যন্ত আর কোনো সভ্যতার বেলাতেই মেহনত করবার সমস্তটুকু দয়া অমনভাবে ক্রীতদাসদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার পথ বের হয় নি। অবশ্য আমাদের দেশের শূদ্রদের কথাও এখানে মনে রাখতে হবে। তাই গ্রীকদের সমাজকে বলে দাস-সমাজ। অথচ, গ্রীক সভ্যতার কথা ভাবতে গেলে সত্যিই ভুললে চলবে না ওই ক্রীতদাসদের কথা। ওদেরই কঙ্কাল দিয়ে গাঁথা হয়েছে অমন অপরূপ আর আশ্চর্য সভ্যতার ভিত্তি।

সত্যিই ভারি আশ্চর্য সভ্যতা এই গ্রীক সভ্যতা, আশপাশের অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করছে, আর সেই প্রদীপের আলো দু-তিন হাজার বছরের ফাঁক পেরিয়েও আমাদের চোখ পর্যন্ত ঠিকরে আসে, আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অথচ, প্রদীপ জ্বালতে গেলে তেল পোড়াতে হয়। ওদের বেলায় তেল ছিলো ওই লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের জীবন, তাদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয়ে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে, আর তবেই জ্বলে উঠেছে ওদের সভ্যতার অমন উজ্জ্বল আলো!

কিন্তু এতো ক্রীতদাস ওরা জোটালো কোথা থেকে? মনে রাখতে হবে, এই রকম ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করে নেবার জন্যে ওদের পক্ষে অনেক অনেক দিন

সময় লেগেছিলো। গ্রীকরা যখন অসভ্য অবস্থায় ছিলো তখন থেকেই একটা কাজে ওরা দারুণ ভালো হাত পাকিয়েছিলো, সে-কাজ হলো যুদ্ধের কাজ। আর যুদ্ধের কাজে অমন পাকা বলেই আশপাশের নানান জাতকে ওরা অনায়াসে হারিয়ে দিতে পেরেছে, পেরেছে পালে পালে ক্রীতদাস জোগাড় করতে।

এইখানে আবার আগেকার একটা কথা মনে করিয়ে দিই। মানুষের গল্পকে ভুল বুঝো না। ক্রীতদাসদের মেহনতের ওপর অমন নির্মমভাবে নির্ভর করেছিলো বলেই গ্রীক সভ্যতাকে খাটো করতে যাবার কোনো মানে হয় না। মনে রেখো, তখনকার অবস্থাটা ছিলো তখনকার মতো অবস্থাই। সে-অবস্থায় ক্রীতদাসদের মেহনতের ওপর অমনভাবে নির্ভর করতে না পারলে সভ্যতার অমন আশ্চর্য কীর্তি সম্ভব হতো কি?

গ্রীক সভ্যতা মানুষের ইতিহাসে যে অপরূপ ঐশ্বর্য দিয়ে গিয়েছে তার তুলনা সত্যিই খুব কম। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, রাজনীতি। কতোই না। অবশ্যই এ-সভ্যতার ভিত্তিতে ছিলো ক্রীতদাসদের নির্মমভাবে শোষণ করবার ব্যাপার। সে-কথা ভুলে যাওয়া যে-রকমের ভুল হবে, সেই রকমেরই গলদ হয়ে যাবে যদি শুধু সেই কথাটুকুই মনে রাখো, আর গ্রীক সভ্যতার অন্য দিকগুলোর কথা যাও ভুলে। গ্রীকদের ঘরে বিজলিবাতি আবিষ্কারই হয় নি, আবিষ্কারই হয় নি উড়োজাহাজ। আর ঠিক তেমনিভাবেই, তখনকার কালে ওদের পক্ষে ক্রীতদাসের মেহনত বাদ দিয়ে অমন আশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তোলবার মতো অবস্থারই সৃষ্টি হয় নি।

আরো একটা কথা আছে। আজকের মানুষ যে এতোখানি ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছে তা তো আর রাতারাতি হবার মতো নয়। তার জন্যে এগুতে হয়েছে ধাপে-ধাপে, অনেক দুঃখ আর অনেক হাহাকারের অন্ধকার ঠেলে ঠেলে। এ ছাড়া এগুবার আর কোনো পথই হয় না, সম্ভবই নয়।

আজকের মানুষের সামনে এক বিরাট বিশাল ভবিষ্যৎ - যেন আলোয় ঝলমল, আনন্দে টলমল। কিন্তু অতো বছর আগে মানুষের সামনে অমন ভবিষ্যৎ কোথায়? আর ওই দাস-সমাজকে পেরিয়ে আসতে মানুষ যদি রাজি না হতো তাহলে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভবই হতো না? তাই ক্রীতদাসের মেহনত লুঠ করবার নির্মম কাহিনী ভুলে যাওয়া যে রকম ভুল হবে সেই রকমই ভুল হয়ে যাবে গ্রীক সভ্যতার সমস্ত মূল্য উড়িয়ে দিতে যাওয়া।

রোমের দম্ভ

কিন্তু এটা কি ঠিক উচিত ব্যাপার? ক্রীতদাসের দল শুধুই খেটে মরবে, খেতে পাবে না, আর যারা মেহনত করবে না তারাই লুঠবে ফুর্তি? এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন এক মহাপণ্ডিত, তিনি বাস করতেন রোম নগরে। তিনি বললেন, মানুষের দল ঠিক মানুষের শরীরের মতোই। এ-শরীরে হাত আছে, আবার পেট বলে জিনিসও আছে।

হাত-দুটো তো সারাদিন খাটে, তবু খাই-খাই করে না। পেটটা একটুও খাটে না, অথচ সমস্ত খাবার তো তার জন্যেই। মানুষের দলের বেলাতেও ওই রকমের হওয়া চাই: কেই কেউ খাটবে, শুধু খাটবে, - কিন্তু তাদের পক্ষে খাই-খাই করা চলবে না। আবার কেউ কেউ বিলকুল গতর নড়াবে না, শুধু খাবে। এতে কারুর পক্ষেই মেজাজ গরম করা চলবে না। শরীরের মধ্যে হাতজোড়া কি কখনো বেঁকে বসে, কখনো কি বলে - সব খাবারটাই যখন পেটে যায় তখন আর আমরা খেটে মরি কেন?

খাসা কথা। রোমানদের পক্ষে একেবারে মনের মতো কথা। কেননা, ওদের অন্দর মহলের খবরটা ওই গ্রীকদেরই মতো- সেই ক্রীতদাস, বেঁচে থাকবার জন্যে যতোখানি মেহনত দরকার তার দায়টা ক্রীতদাসদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা। এদিক থেকে গ্রীকদের সঙ্গে রোমানদের তফাত ছিলো উনিশ-বিশের : গ্রীকরা হয়তো ফালতু সময়টায় বসে থিয়েটার দেখতো আর রোমানরা হয়তো সিংহের খাঁচায় ক্রীতদাসকে পুরে দিয়ে মজা দেখতো সিংহ কেমন করে মানুষ ছিঁড়ে খায়! গ্রীকরা হয়তো ক্রীতদাসদের অষ্টপ্রহর লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো না, হয়তো ক্রীতদাসদের লেখাপড়াও শেখাতো, কেননা লেখাপড়া শিখে নিলে ক্রীতদাসরাই বাড়ির ছেলেপুলেদের লেখাপড়াও শেখাতো, কেননা লেখাপড়া শিখে নিলে ক্রীতদাসরাই বাড়ির ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখাতে পারবে; তার মানে মাস্টারি করবার মেহনতটুকুও ক্রীতদাসদের ঘাড়ে তুলে দেওয়া যাবে। আর রোমানরা হয়তো ক্রীতদাসদের জন্যে ব্যবস্থা রেখেছিলো শুধু চামড়ার চাবুকের। এই সব উনিশ-বিশের তফাত। এই সব তফাত নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করবারও মানে হয় না। কেননা, যাকে বলে দাস-প্রথা সেদিক থেকে দুই-ই এক : সেই গোরু-ভেড়া আর হাল-লাঙলের মতো মানুষ নিয়ে কেনা-বেচা, সেই নগদ পয়সা দিয়ে কেনা মানুষগুলোর ঘাড়ে মেহনতের সবটুকু দায় তুলে দেওয়া –গ্রীক সভ্যতার অন্দর মহলে যে-রকম, রোমান সভ্যতার অন্দর মহলেও সেই রকমই।

তফাত আসলে দুটো সভ্যতার সদর মহলের। ক্রীতদাসদের কাঁধের ওপর মেহনতের সবটুকু দায় চাপিয়ে দিয়ে গ্রীকরা মন দিয়েছিলো শিল্প, সাহিত্য, দর্শন আর বিজ্ঞানের দিকে। কিন্তু রোমানরা? ওরা মন দিয়েছিলো শুধু ডাকাতি করবার দিকে –শুধু পরের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতরাজ করবার দিকে। রোমানদের ইতিহাসে তাই একের পর এক যুদ্ধের কথা, লেখাপড়া বা জ্ঞানচর্চা করবার কথাটা বড়ো নয়। তার মানে, রোমান সভ্যতার অন্দর মহলে ক্রীতদাসদের আর্তনাদ, সদর মহলে ডাকাত-দলের উল্লাস। অবশ্য অনেকে রোমানদের অনেক রকম কীর্তিকলাপ নিয়ে উচ্ছাস করেন –কেউ বা শোনাতে চান ওদের বীরত্বের কথা, দিগ্বিজয়ের মহিমা। আবার কেউ বা বলেন রোমানদের তৈরি আইনকানুনগুলো নাকি খুবই অসাধারণ। কিন্তু অতো উচ্ছ্বাস করবার আগে মনে রাখা দরকার দিগ্বিজয়টা হলো

ডাকাতিরই গালভরা নাম আর আইনকানুনগুলো আসলে গরিব লোকদের শায়েস্তা রাখবার কায়দাকানুন ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু ক্রীতদাসরা যে শুধু মুখ বুজে চামড়ার চাবুক খেয়েছে এ-কথা মনে করলেও নেহাতই ভুল করা হবে। ওরাও শিখেছিলো দল বাঁধতে, দল বেঁধে একজোট হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে, বলতে : অত্যাচার মানবো না, মানবো না চামড়ার ওই চাবুক, সিংহের খাঁচায় ফেলে দিয়ে ফুর্তি দেখার পালা। বিদ্রোহ করেছিলো ওরা –বারবার বিদ্রোহ, দারুণ বিদ্রোহ সে সব। মালিকদের মালিকানা বারবার টলমল করে উঠেছে। তাছাড়া, মালিকদের নিজেদের মধ্যেও মারামারি কাটাকাটি : পরের দেশ লুঠ করে আনা অগাধ ধনরত্ন আর এই ধনরত্নের ভাগাভাগি নিয়ে মারপিট। একদিকে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ আর একদিকে নিজেদের মধ্যে মারপিট –শেষ পর্যন্ত এরই দরুন শেষ হলো রোমের দম্ভ। কেমনভাবে তাই দেখা যাক।

রোমের পতন

একের পর এক আশপাশের দেশগুলোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া। লুঠ করে আনা অগাধ ধনরত্ন, আর সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস। আর তারপর, এই ক্রীতদাসদের ঘাড়ে মেহনত করবার সবটুকু দায় চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ফুর্তি করা। রোম-সভ্যতার এইটেই হলো আসল চেহারা। দিগ্বিজয় আর দাসপ্রথা।

এমনিতে মনে হতে পারে, অবশ্য অন্য দেশের পক্ষে এ-ব্যবস্থা যতো অন্যায়ই হোক না কেন, অন্তত রোমানদের পক্ষে এমনতরো ব্যবস্থা তো প্রায় ভূস্বর্গের মতো! রোমানরা অপরের দেশ লুঠ করে আনা দেদার ধনসম্পদ ভোগ করবে, অন্য দেশ থেকে বন্দী করে আনা মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো খাটিয়ে নিয়ে নিজেরা আয়েস করবে –রোমানদের পক্ষে এর চেয়ে মজাদার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

আসলে কিন্তু তা নয়। মানুষের গল্পের এমনই ব্যাপার যে শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার দরুনই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ওদের নিজেদের সর্বনাশও। কেমন করে তা দেখা যাক।

দিগ্বিজয়। কিন্তু অন্যের দেশ জয় করতে হলে ঝাঁকে ঝাঁকে দেশের ছেলেদের বিদেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। এই পাঠানো কিন্তু চিরকালের মতো। কেননা, তারা আর দেশে ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে না কেন? কেননা, তারা চলেছে দিগ্বিজয়ের জন্যে, অর্থাৎ কিনা অন্য দেশের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। আর লড়াইতে তাদের কায়দাকানুন যতো ভালোই হোক না কেন, তাদের মধ্যে অনেককে তো মরতে হবেই। না মরে উপায় নেই। অবশ্য সবাই নিশ্চয়ই মরবে না। কিন্তু যারা মরবে না তারাও আর ফিরে আসবে না নিজের দেশে। তা কেন? কেননা, একটা দেশ শুধু জয় করলেই তো আর হলো না; দেশটাকে জয় করবার পর

শাসনেও রাখতে হবে। আর শাসনে রাখতে হবে বলেই সে-দেশে ঘাঁটি পাততে হবে –সৈন্যসামন্তের ঘাঁটি। তাই যুদ্ধের পর যারা মরলো না তারাও দেশে ফিরতে পারলো না, রয়ে গেলো ওই ঘাঁটিগুলোয়।

তাই, এই দিগ্বিজয়ের খাতিরেই দেশ থেকে দেশের ছেলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উজাড় হয়ে যেতে লাগলো। ফলে ক্রমশ দেখা গেলো, দেশের মানুষের সঙ্গে দেশের জমি-জমা, দেশের চাষবাস, দেশের শিল্প, দেশের বাণিজ্য –সব কিছুর সম্পর্ক যাচ্ছে ঘুচে। আর যদি তাই হয়, তাহলে চাষবাসই বলো আর শিল্প-বাণিজ্যই বলো, সবকিছুর দশাই ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠবে না কি? রোমের বেলায় দেখা গেলো ক্রমশ তাই হয়ে উঠছে।

তাই ইতিহাসের বই লিখতে বসে হালের একজন খুব নামকরা পণ্ডিত বলেছেন : দূর দেশে গিয়ে মরবার জন্যে ইতালী বিসর্জন দিতে লাগলো তার নিজের সন্তানদের, আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার জুটলো লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস!

ক্রীতদাস। দাসপ্রথা। প্রথম দিকটায় মনে হয়েছিলো ভারি লাভের ব্যাপার বুঝি! ওরা থাকবে চাবুকের আগায়, মরবে হাড় কালি করে। কিন্তু ওদের দেওয়া হবে নিছক সেইটুকু যেটুকু নইলে কোনোমতেই জান বাঁচে না। আর ওদেরই মেহনত দিয়ে তৈরি বাকি সবটুকু জিনিসই একেবারে উজাড় করে নেওয়া হবে ওদের কাছ থেকে। দারুণ লাভের ব্যাপার নয় কি?

যতোই দিন যায় ততোই চোখে পড়ে, আসলে কিন্তু তা নয়। আর শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এই দাসপ্রথা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। কেমনভাবে –তাই বলি।

ক্রীতদাসরা হলো প্রভুর সম্পত্তি, গোরুর মতো, গাধার মতো। বাঁচবার ব্যাপারে তার নিজের কোনোরকম অধিকারই নেই। সে যেন হাল-লাঙলের মতো আর পাঁচ রকম হাতিয়ারের মধ্যে একটা হাতিয়ার মাত্র। তফাতের মধ্যে শুধু এই, যে এ-হাতিয়ারটা কথা কইতে পারে, এর ধড়ে প্রাণ আছে। তার নিজের গতর দিয়ে তৈরি জিনিসের ওপর তার নিজের কোনো রকম অধিকার নেই। আর যদি তাই হয়, তাহলে এই ক্রীতদাসের পক্ষে পৃথিবীকে আরো বেশি করে জয় করবার, পৃথিবীর সঙ্গে আরো ভালো করে লড়াই করবার, সত্যিই কি কোনো রকম তাগিদ থাকতে পারে? কী লাভ মাটির বুকে বেশি করে ফসল ফলিয়ে? কী লাভ খনি খুঁড়ে বেশি করে জিনিস তুলে এনে? কামারশালে কামার, তাঁতশালে তাঁতি –কারুর পক্ষেই বেশি জিনিস তৈরি করবার কোনো রকম উৎসাহ থাকতে পারে না! কেননা, যতো বেশি জিনিসই সে তৈরি করুক না কেন, তাতে তার নিজের কপাল একটুও ফিরবে না। তাই, চাবুকের ভয়ে যতোটুকু মেহনত না করলেই নয় শুধু ততোটুকু মাত্র মেহনত করা। তার মানে, মেহনতের কোনো গা নেই, উৎসাহ নেই।

মোটের ওপর ফলটা দাঁড়ালো কী রকম? আবিষ্কারের অভিযানটা যেন থমকে থেমে গেলো। পৃথিবীকে বেশি করে আর ভালো করে জয় করবার কায়দা নিয়ে কার মাথাব্যথা? কারুরই নয়। ক্রীতদাসদের মধ্যে সে-উৎসাহ ঘুচে যেতে কেন বাধ্য তা

তো দেখতেই পেলে। আর মালিকের দল? পরের মেহনতের ওপর নির্ভর করতে করতে তারা তো দিনের পর দিন অকর্মণ্যই হয়ে চললো। হাতে-কলমে কাজ করবার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই পৃথিবীকে জয় করবার নতুন কায়দা বের করবার কথা তাদের বেলাতে তো ওঠেই না!

তা ছাড়া, ক্রীতদাসদের অমন অমানুষিকভাবে শোষণ করে মালিকরা যে সম্পদটা পেতো সেটার কথাও একবার ভেবে দেখো। কী হতো সেই ধনরত্নের? পৃথিবীকে নতুন কায়দায় জয় করবার উৎসাহে কী রকম ভাঁটা পড়েছে! তাই ওই অগাধ ধনসম্পদ নিয়ে মালিকদের পক্ষে শুধুই ফুর্তি করা, ওটাকে যেন খই-কলা করে খরচা করে ফেলা, উড়িয়ে দেওয়া। তার মানে, ওই ধনসম্পদের কোনো আদায়ই থাকে না, দেশের কোনো রকম মঙ্গল হয় না ও থেকে। কথাটা ভালো করে বুঝছো তো? যেমন ধরো, আমাদের দেশে আজ যদি কেউ এক কোটি টাকা পায়, আর সেই টাকাটা দিয়ে সে যদি কোনো কারখানা ফাঁদে, তাহলে তাতে নিশ্চয়ই দেশের লাভ হবে। কেননা তাতে মোটের ওপর দেশের সম্পদ খানিকটা তো বাড়বেই। কিন্তু তার বদলে সে যদি ওই টাকাটা শুধু ফুর্তি করে ফুঁকে দেয় তাহলে তাতে দেশের কোনোই লাভ নেই। কেননা, এ থেকে পৃথিবীকে বেশি করে জয় করবার ব্যাপারে দেশের মানুষকে এগিয়ে চলতে কোনো রকম সাহায্যই করা হবে না।

রোমের প্রভুরা জানতো শুধু বিলাসিতা আর ওই রকম বিলাসিতা করে সমস্তটুকু ধনসম্পদ উড়িয়ে দিতো বলে তার থেকে দেশের কোনো রকম উন্নতি হতো না। শুধু তাই নয়, লুঠতরাজের ভাগবাঁটরা করা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই ক্রমশ শুরু হয়ে গেলো দারুণ মারপিট, লড়ালড়ি। আর তাই টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগলো রোমের দম্ভ।

দাসপ্রথা কীভাবে একেবারে অচল হয়ে পড়তে লাগলো তার আরো একটা মস্ত জরুরী দিক আছে। ক্রমশ দেখা যেতে লাগলো, ক্রীতদাস কেনবার বাজার-দর যতোই পড়ে যাক না কেন, নেহাত নামমাত্র দামে হাজার হাজার ক্রীতদাস কিনেও প্রভুদের আর তেমন লাভ হচ্ছে না। কেননা, ওরা আর মুখ বুজে জান কবুল করে মালিকদের জন্যে মেহনত করতে রাজি হচ্ছে না। তার বদলে বরং জান কবুল করে ওরা রুখে দাঁড়াচ্ছে মালিকদের বিরুদ্ধে। তারা দল বাঁধতে শিখছে, জারি করছে বিদ্রোহ। এ-সব বিদ্রোহ সত্যিই খুব ছোটোখাটো রকমের বিদ্রোহ নয়। ক্রীতদাসরা যখন একজোট হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন একেবারে দুর্বার হয়ে উঠেছে তাদের শক্তি, কেঁপে উঠেছে রোম সাম্রাজ্যের ভিত্তিটা! এই সব বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে বহুত বহুত পাইক-পেয়াদা আর সেপাই-লস্কর দরকার। এর জন্যে খরচা বড়ো কম নয়। তাই, যতোই দিন যায় মালিক-প্রভুরা ততোই স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে নেহাত জলের দরে ক্রীতদাস খরিদ করেও শেষ পর্যন্ত যেন পোষায় না। এদের শাসনে রাখতে হলে খরচা করতে হয় দেদার।

এইভাবে, নানান দিক থেকে দেখা যেতে লাগলো, দাসপ্রথা একেবারে অচল হয়ে পড়ছে। তাই ঘনিয়ে আসতে লাগলো রোমের পতন।

পাথরের দুর্গ আর বীর পুরুষের বল্লম

শেষ হলো রোমের দম্ভ, সে প্রায় যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার শ-পাঁচেক বছর পরের কথা।

অচল হয়ে পড়লো দাসপ্রথা। মালিকরা দেখলো ক্রীতদাস কিনে আর লাভ নেই। তাই তারা একটা অন্য ব্যবস্থা করতে শুরু করলো। সে-ব্যবস্থাটা হলো, নিজেদের এলাকার বড়ো বড়ো জমিগুলো ভাগ করে নিয়ে আলাদা আলাদা টুকরোয় আলাদা আলাদা চাষী বসানো। এ-ছাড়া অবশ্য নিজেদের জন্যে তারা অনেকখানি করে খাস জমিও রেখে দিলো। ব্যবস্থা হলো, চাষীরা অর্ধেকটা করে সময় বেগার খাটবে প্রভুদের ওই খাস জমিতে, আর বাকি অর্ধেকটা করে সময় খাটবে নিজেদের টুকরো জমিতে। মালিকদের জমিতে মেহনত করবার ফলটা পাবে মালিক, টুকরো জমিতে মেহনতের ফলটা পাবে চাষীরা। কিন্তু তাই বলে চাষীরা যে পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেলো তা মোটেই নয়, প্রভুর মর্জি ছাড়া গাঁ থেকে এক পা নড়বারও হুকুম নেই, যেন জমির সঙ্গে শেকল দিয়ে তাদের বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা। তাই তাদের নাম হলো ভূমিদাস, ইংরেজীতে বলে সার্ফ।

এদিকে রোমের দম্ভ শেষ হবার মুখোমুখি সময় থেকে ইউরোপের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে নতুন এক জাতের লোক, তাদের নাম টিউটন-জার্মান। এরা নানান জায়গা দখল করতে শুরু করলো আর এদের সঙ্গে মিশেল খেতে লাগলো সেই সব জায়গায় পুরোনো জাতগুলো। এইভাবে মিশেল খেতে খেতে সারা ইউরোপময় নতুন নতুন জাতি দেখা দিতে লাগলো –এই সব নতুন নতুন জাতিই হলো আজকালকার ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী। নতুন জাতিদের মধ্যে আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে লাগলো ওই ব্যবস্থাই: বড়লোক আর তাদের বড়ো বড়ো খাস জমি, ভূমিদাস আর তাদের টুকরো জমি –বড়োলোকের জমিতে ভূমিদাসদের বেগার খাটা।

একদিকে সার্ফ, মেহনতের সবটুকু দায় তাদেরই ওপর। আর একদিকে বড়োলোক, মালিক। মালিকদের মধ্যে অবশ্য ছোটো-বড়োর নানান তফাত। সবচেয়ে চুড়োয় বসে দেশের মহারাজা। তারপর ছোটোখাটো রাজা-রাজড়া, আবার তাদের তলায় জমিদার, জায়গিরদার, নানান ধরনের। ইংরেজীতে এদের সব হরেক রকমের নাম : আর্ল, কাউন্ট, ব্যারন। এক এক এলাকার ভূমিদাসদের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস লুঠ করবে সেই এলাকার জমিদার, জায়গিরদার। তার থেকে খানিকটা বখরা পাবে বড়ো জমিদার, আবার তারো খানিকটা বখরা পাবে আরো বড়ো জমিদার –এই ভাবে শেষ পর্যন্ত মহারাজের ভাঁড়ার পর্যন্ত। লুঠের মাল থাকে-থাকে, ধাপে-ধাপে, বখরা করার ব্যবস্থা।

শোষকদের মধ্যে, রাজা-রাজড়া ছাড়াও পাণ্ডা-পুরুতদের দল। তখনকার গির্জেগুলোয় তাদের ঘাঁটি, তাদের মধ্যেও ছোটো-বড়ো-মাঝারির নানান তফাত। ধর্মের নামে গরিব ঠকিয়ে যা আদায় করা যায় তারও বখরা এই সব ছোটো-বড়ো-মাঝারি পাণ্ডা-পুরুতদের মধ্যে। যে সবচেয়ে চুড়োয় বসে তার নাম পোপ, তারও অগাধ সম্পত্তি, অনেক প্রতিপত্তি। পাণ্ডা-পুরুতদের আসল কাজ ছিলো দেশের লোককে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখা, যাতে তারা মাথা না তুলতে পারে, যাতে তাদের চোখ না ফোটে, তারা যাতে ঝিমিয়ে থাকে তারই ব্যবস্থা করা। তাই সব রকম লেখাপড়ার ওপর এই গির্জে-ওয়ালাদের কড়া পাহারাদারি –ধর্মের পুঁথিতে যা লেখা আছে তা ছাড়া একটি কথাও মুখ ফুটে বলবার জো নেই; বলতে গেলেই নাস্তিক বলে, ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হবে। অবশ্য ধর্মের পুঁথি পড়বার অধিকার বা ক্ষমতা সকলের নেই। প্রাচীন কালের ভাষায় লেখা। সহজ মাতৃভাষায় তর্জমা করতে যাওয়া বিপদের ব্যাপার।

দাসপ্রথার পর ইউরোপে এই যে নতুন ধরনের ব্যবস্থা দেখা দিলো এর নাম দেওয়া হয় সামন্ত-প্রথা।

দাসপ্রথার ভিত্তিটায় যে-রকম ক্রীতদাসের মেহনত, সামন্ত-প্রথার ভিত্তিতে সেই রকম ভূমিদাসদের মেহনত। আর পাছে এই ভূমিদাসদের দল বেঁকে বসে সেই জন্যে হরেক রকম আইন-কানুন। কিন্তু শুধু আইন-কানুন হলেই তো আর চলবে না! পাইক-পেয়াদাও দরকার –আইনগুলো যদি কেউ মানতে নারাজ হয় তাহলে বল্লম উঁচিয়ে তেড়ে আসবে পাইক-পেয়াদার দল। এই সব পাইক-পেয়াদার যারা সর্দার তাদের নাম দেওয়া হতো নাইট বা বীরপুরুষ। বল্লম হাতে বর্ম গায়ে ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো উড়িয়ে দেশময় তারা শোষকদের দাপট জারি করে বেড়াতো, হেন অত্যাচার কল্পনা করা যায় না যা তাদের অসাধ্য ছিলো। আসলে এই সব নাইট বা বীরপুরুষরা ছিলো ছোটোখাটো ডাকাতদলের সর্দারই। বড়োলোকরা দেখলো এদের খানিকটা খাতির করতে হবে, আর তাছাড়া লুঠের মাল থেকে কিছুটা বখরাও দিতে হবে। খাতির করে ওদের রাজসভায় ডাকা হলো, বলা হলো ওরা বীরপুরুষ, ওরা নাইট।

বীরপুরুষের দল! সকাল বেলায় হাঁটু গেড়ে তারা যীশুখ্রীষ্টের নামে শপথ করে, বলে আর্তকে ত্রাণ করাই আমাদের জীবনের ব্রত। আর তারপর, চরম অত্যাচারের ধ্বজা উড়িয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সমস্ত দেশটাকে ওরা কাঁপিয়ে বেড়ায়। বীরপুরুষ বই কি! ওদের নিয়ে কতোই না ছেলেভুলোনো রঙিন গল্প, কতোই না গল্প বড়ো বড়ো পাথরের দুর্গে বসে যে-সব জমিদার শুধু আয়েস করতো তাদের নিয়ে। কিন্তু এই সব গল্প শুনে ভুললে চলবে না ভূমিদাসদের কথা, যাদের মেহনত দিয়ে সামন্ত যুগের সবটুকু ঐশ্বর্য গড়া হয়েছে, অথচ যাদের পিঠে শুধু অভাব আর অত্যাচারের বোঝা।

চলো যাই শহরে

মানুষ তখনো আজকালকার অর্থে বড়ো বড়ো শহর গড়তে শুরু করে নি, প্রধানতই গ্রাম আর গ্রাম। ক্ষেতে-খামারে ভূমিদাসের দল। পাথরের দুর্গে রাজা-জমিদার। গির্জায় গির্জায় পুরোহিত-পাদ্রী। আর ওই বীরপুরুষদের বল্লম। হাজার খানেক বছর ধরে ইওরোপে সভ্যতার চেহারাটা মোটের ওপর এই রকমই। তারপর যেন মোড় ঘুরলো।

মোড়-এর কথাটা মনে রাখতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম, টানা টানা রাস্তা চলেছে এক গ্রামের পর আর এক গ্রাম পেরিয়ে। এই সব রাস্তাগুলোর বড়ো বড়ো মোড়ে মাঝে মাঝে মেলা বসতো, আর এই মেলাগুলো দিনের পর দিন বেশ জাঁকালো হয়ে উঠতে লাগলো, কেনা-বেচার রেওয়াজ বাড়তে শুরু করলো। আর তারপর, কেনা-বেচার রেওয়াজ যতো বাড়তে লাগলো ততোই এই সব মোড়গুলোর আশপাশেই দেখা দিতে লাগলো বড়ো বড়ো শহরের সূচনা। মোড় ঘুরলো মানুষের সভ্যতা, এগিয়ে এলো গ্রাম ছেড়ে আধুনিক শহরের দিকে।

কেন অমনভাবে মোড় ঘুরলো? তার কারণ, ওই কেনাবেচার রেওয়াজ বেড়ে যাওয়া। কেনা-বেচার রেওয়াজ কেন বাড়লো? এই কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে।

এর আগে পর্যন্ত, তার মানে পুরো সামন্ত যুগ ধরে, মানুষের মেহনত বেশির ভাগই চাষবাসের কাজে। কুটিরশিল্প বা কারিগরদের কাজ যে ছিলো না তা নয়, কিন্তু প্রধান ঝোঁকটা তার ওপর নয়। কিন্তু সামন্ত-যুগের শেষাশেষি দেখতে পাওয়া যায় ঝোঁকটা বদলে যাচ্ছে, অনেক অনেক মানুষ চাষবাস ছেড়ে কুটিরশিল্পের দিকে বেশি করে মেহনত করতে শুরু করছে। আর তাই, চাষীদের কাজ আর কারিগরদের কাজ, এ-দুয়ের মধ্যে তফাতটা বেশ স্পষ্ট হয়ে এলো। দেখা গেলো কারিগরদের দল একটা নতুন দল। তাঁতি-মুচি, মিস্ত্রি-ছুতোর, কুমোর-কামার, এই সব নানান রকম কারিগর। মধ্য যুগে কিন্তু কারিগর বলে এ-রকম একেবারে আলাদা কোনো দল ছিলো না –চাষীরাই খানিকটা করে সময় কারিগরের কাজ করতো।

কারিগর বলে আলাদা একটা দল যতোই স্পষ্ট হয়ে পড়ে ততোই সরগরম হয় হাটবাজারগুলো। কেননা চাষীদের কাজ আর কারিগরদের কাজের মধ্যে একটা মস্ত তফাত আছে। চাষীদের মেহনত দিয়ে যে-জিনিস তৈরি তার মধ্যে অবশ্য অনেকখানিই যায় জমিদারদের কবলে, কিন্তু যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু কেনা-বেচা বা লেনদেন করার জন্যে নয়, –তার বদলে নিজেদের ভোগে লাগাবার জন্যে, নিজেদের ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু কারিগরদের মেহনত দিয়ে যে-জিনিস তৈরি হয় তার মধ্যে বেশির ভাগটাই লেনদেনের জন্যে, কেনা-বেচার জন্যে, –নিজেদের ব্যবহারের জন্যে নয়। ধরো, একজন চাষী বিশ মণ ধান ফলালো, এই বিশ মণের মধ্যে হয়তো বেশিটা গেলো জমিদারের কবলে, কিন্তু বাকিটা বাজারে বিক্রি করবার জন্যে নয়, তার বদলে নিজের সংসার চালাবার জন্যে, নিজেদের পেটের জ্বালা

মেটাবার জন্যে। কিন্তু একজন তাঁতি যদি মেহনত করে বিশ জোড়া কাপড় বোনে তাহলে এই বিশ জোড়ার মধ্যে হয়তো উনিশ জোড়াই বাজারে বিক্রি করবার জন্যে –নিজের পরনের জন্যে নয়, লেনদেন করবার জন্যে। একটা কোনো জিনিস যদি নিজে ব্যবহার করবার জন্যে তৈরি না করে বাজারে বেচবার জন্যে তৈরি করা হয়, লেনদেন করবার জন্যে তৈরি করা হয়, তাহলে সে-জিনিসটাকে বলে পণ্য। তাই কারিগরদের কাজ বেড়ে যাওয়া মানেই পণ্য তৈরির কাজ বেড়ে যাওয়া, আর পণ্য তৈরির কাজ বেড়ে যাওয়া মানেই সরগরম হয়ে ওঠা হাটবাজারগুলো –কেননা, হাটবাজারগুলোতেই তো পণ্য নিয়ে কেনা-বেচা।

কিন্তু কেনা-বেচার কাজটা করবে কে? কারিগররা নিজেরা নিশ্চয়ই নয়। তার বদলে, ব্যবসাদারের দল। ব্যবসাদাররা দশটা গ্রাম টহল মেরে কারিগরদের জিনিস কিনে নিলো আর তারপর সেগুলো নিয়ে চললো হাটবাজারে কেনা-বেচার জন্যে। হাটবাজারগুলো তাই ব্যবসাদারদের ঘাঁটি, সেখানে ব্যবসাদারদেরই বেশি ভিড়। এর আগে পর্যন্ত ব্যবসাদারদের অবস্থাও তেমন ভালো নয়, দেমাকও তেমন বেশি নয়। কিন্তু তাদের ব্যবসা যতোই ফেঁপে উঠতে লাগলো ততোই বদলাতে লাগলো তাদের অবস্থা।

ওদের ব্যবসাগুলো ফেঁপে ওঠবার আরো একটা কারণ ছিলো। সামন্ত যুগে পাণ্ডা-পাদ্রীদের উৎসাহে একরকম যুদ্ধযাত্রার রেওয়াজ শুরু হয়েছিলো, সেগুলোকে ওরা বলতো ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। নাম ধর্মযুদ্ধ, কেননা যুদ্ধযাত্রার পেছনে ধর্মের দোহাই। পাণ্ডা-পুরুতরা বলতো : পুবদিকের দেশেই যীশুখ্রীষ্টের জন্ম, অথচ, সে-দেশ মুসলমানদের কবলে, অতএব লড়াই করে জয় করতে হবে ওই সব দেশ। কিন্তু নামে ধর্মযুদ্ধ হলে কী হয়, আসল মতলবটা একেবারে অন্য। আসলে, পুবদেশের ধনরত্নের কথা শুনতে পুরোহিত আর জমিদারের চোখ লোভে চকচক করে উঠতো, সেই ধনরত্ন লুঠ করবার মতলবেই যুদ্ধ কেবল দেশের লোককে বোকা বানিয়ে খেপাতে না পারলে তো আর যুদ্ধ করা চলে না –লড়বে তো তারাই, মরবে তো তারাই, জমিদার আর পুরোহিত নিজেরা তো নয়। তাই ঢাক পিটিয়ে রটাবার ব্যবস্থা যে ওগুলো আসলে ধর্মযুদ্ধ! ব্যবসাদাররা কিন্তু বিলক্ষণ ধূর্ত লোক; তারা ভাবলো এই মওকায় কিছু কামিয়ে নেওয়া যায়। আমীর-বাদশাদের ওইসব দেশে হরেক রকম শৌখিন জিনিস –খসবু আতর আর রান্নার মসলাপাতি থেকে শুরু করে হীরে-জহরত পর্যন্ত। ধর্মযুদ্ধের হিড়িকে ভিড়ে গিয়ে পুবদেশের থেকে এই সব শৌখিন জিনিস আমদানি করতে পারলে ইউরোপে চড়া দরে বিক্রি করা চলবে : পুরুত-পাণ্ডা আর রাজা-জমিদাররা এমন সব শৌখিন জিনিস পেলে খুশি হয়েই কিনবে!

ব্যবসাদারের দল পুবদিকের দেশ থেকে হরেক রকম শৌখিন জিনিস আমদানি করতে লাগলো। এদিকে কিন্তু ইউরোপের রাজা-জমিদাররা খুব বড়োলোক হলেও তাদের হাতে কাঁচা টাকা তো বেশি নয়। তাদের কবলে অনেকখানি করে খাসজমি,

অনেক ভূমিদাস সেখানে বেগার খাটে, পাওয়া যায় অনেক ফসল, –কিন্তু কাঁচা টাকা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? জমিদাররা তাই দেখলো, খাস জমি রাখবার চেয়ে বরং জমিগুলো চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া ভালো; তারা চাষ করুক, ফসল বেচুক আর খাজনা দিক কাঁচা টাকায়।

কেনা-বেচার রেওয়াজ বাড়লো। কেনা-বেচার ব্যাপারে ব্যবসাদারদের লাভ চারদিক থেকে : চাষীদের কাছ থেকে সস্তায় ফসল কিনে চড়া দরে বিক্রি করার লাভ, আবার চাষীদের হাতে যেটুকু নগদ টাকা দিতে হলো সেটুকুও জমিদারদের ঘর ঘুরে ব্যবসাদারদের কাছেই ফিরে আসবে –কেননা শেষ পর্যন্ত জমিদাররা তো শৌখিন জিনিস কেনবার জন্যেই খরচা করবে সে-টাকা। তাছাড়া, ব্যবসাদাররা নগদ টাকা সুদে খাটাতেও কসুর করে নি : চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া যাবে জমিদারদের, শৌখিন জিনিস কেনবার লোভে তারা সুদের কথায় পিছপা হয় না। কিন্তু ওরা শোধ দেবে কেমন করে? প্রজাদের অমানুষিক পীড়ন করে নগদ খাজনা আদায় করবারও তো একটা সীমা আছে! জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে তাই আবার জমি কেড়ে নিতে লাগলো; জমিতে প্রজা বসিয়ে চাষাবাদ করবার চেয়ে লোক লাগিয়ে ভেড়া চরানোয় নগদ লাভটা বেশি। জমিদারদের দেখাদেখি অনেক অবস্থাপন্ন চাষীও এই দিকে মন দিতে লাগলো। দেখা গেলো, ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাগ-করা চাষের জমির বদলে বিরাট বিরাট ভেড়া চরাবার জমি। আর দেখা গেলো সর্বহারা মানুষের দল –আগে তারা চাষী ছিলো, কিন্তু চাষের জমিটুকু খোয়া যাবার পর গতর খাটাবার শক্তি ছাড়া তাদের আর কোনো সম্বল রইলো না। শেষ পর্যন্ত এরাই শহরে-শহরে ঘুরতে লাগলো কারখানায় দিনমজুরি জোটবার আশায়। কিন্তু সে-কথা পরের কথা, একটু পরে তুলবো।

ফেঁপে উঠতে থাকে ব্যবসাদারদের ব্যবসা, তাদের হাতে জমতে থাকে অনেক কাঁচা টাকা। তারা সওদাগরি নিয়ে দূর বিদেশে পাড়ি দেবারও তাল খোঁজে, বড়ো বড়ো নাবিকদের ডেকে বলে : সমুদ্র পাড়ি দেবার পথ খোঁজো, খরচ যা লাগবে আমরা দেবো। কলম্বাস বার করলেন আমেরিকা, ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে পৌঁছবার পথ। ব্যবসা-বাণিজ্য রমরমা জমে উঠতে লাগলো!

এদিকে ব্যবসা যতোই জমে ওঠে ততোই ব্যবসাদারদের উৎসাহে দেশে জিনিস তৈরি করবার ব্যবস্থা বদলে যায়। বদলটা কী রকম? আগেকার দিনে কারিগর একটা পুরো জিনিস নিজেই তৈরি করতো –যে কাপড় বুনছে সে-ই সুতো কাটছে, রঙ করছে। কিন্তু ব্যবসাদাররা দেখলো, একই লোক যদি পুরো একটা জিনিস নিজে নিজে তৈরি করতে চায় তাহলে সময় লাগে বেশি। তার চেয়ে বরং যে সুতো কাটবে সে শুধু সুতোই কাটুক, যে তাঁত চালাবে সে শুধু তাঁতই চালাক, যে রঙ করবে সে শুধু রঙই করবে। এইভাবে কাজ চলবে অনেক বেশি। তাছাড়া কেউ যদি সারাদিন ধরে একঘেয়ে একই কাজ করে চলে তাহলে তার পক্ষে এমন কিছু পাকা কারিগর

হবার দরকার হয় না; তাই এই রকম ভাবে কাজটা ভাগাভাগি করে দেবার কায়দা চালু হলে শুধু আর ওস্তাদ কারিগরদের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না, মেহনত করবার লোক জোগাড় হয় অনেক বেশি। ওস্তাদরা শুধু তদারকটুকু করলেই হলো।

কারিগরদের কাজের ব্যাপারে এ ছাড়াও একটা মস্ত তফাত দেখা দিলো। কাজ করবার যা হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি, আগেকার দিনে সেগুলো ছিলো কারিগরদের নিজেদের জিনিস : তাঁতি যে –তাঁত তার, কামার যে –কামার শাল তার। কিন্তু নতুন অবস্থায় হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতিগুলো কারিগরদের নিজেদের নয়। এগুলো হলো ওস্তাদ কারিগর আর ব্যবসাদারদের সম্পত্তি। কারিগররা এসে সেগুলো নিয়ে গতর খাটাবে, কিন্তু সেগুলোর মালিক হবে না। আর ওগুলো যতো ভালো হবে, যতো উন্নত হবে, ততোই বেশি জিনিস তৈরি করা যাবে; তাই ব্যবসাদার আর ওস্তাদ কারিগররা মন দিলো এগুলোকে ভালো করবার, উন্নত করবার দিকে।

বোম্বেটেদের দল

এই সব অদলবদল চলতে লাগলো অনেকদিন ধরে, একটানা প্রায় চারশো বছর ধরে। আর তারপর দেখা গেলো পুরোনো সভ্যতার বদলে একটা নতুন সভ্যতার চেহারা। এতো আশ্চর্য এই নতুন সভ্যতা, যে চেয়ে দেখলে যেন চোখ ঝলসে যায় : শহরে শহরে বিরাট বিরাট কারখানা, চিমনির কালো ধোঁয়ায় আকাশটা যেন কুঁকড়ে উঠছে, কলের তীব্র বাঁশিতে শিউরে উঠছে শেষ রাত –আর রূপকথার সবচাইতে ডাকসাইটে দৈত্যরাও যে-কাজ কল্পনা করতে পারতো না এই সব কারখানায় মানুষ তাই করতে শুরু করেছে প্রায় ছেলেখেলার মতো করে!

কেমন করে মানুষ গড়লো ওই সব কারখানা? হাওয়া দিয়ে তো আর কারখানা গড়া যায় না। কাঁচা টাকা লাগে –অনেক, অনেক কাঁচা টাকা। জমি কেনবার টাকা, বাড়ি গাঁথবার টাকা, কলকজা আর যন্ত্রপাতির জন্যে টাকা, কাঁচা মাল কেনবার জন্যে টাকা, মজুরদের দিনমজুরি দেবার টাকা, তৈরি মাল দেশ-বিদেশে বিক্রির ব্যবস্থা করতে টাকা। টাকা, টাকা, টাকা। অনেক পুঁজি চাই, তা নইলে, অমন বড়ো বড়ো কারখানা-কারবার ফাঁদা যাবে কেমন করে?

ব্যবসাদাররা এতো টাকা, এতো পুঁজি কেমন করে জোগাড় করলো? ব্যবসা করে? সওদাগরি করে? তেজারতি করে? অনেকখানি তাই। কিন্তু শুধু তাতে অতো টাকা জোগাড় করা যায় না। তাই আরো একটা ব্যবস্থা ওরা করেছিলো। সেটার নাম হলো ডাকাতি করা, বোম্বেটেগিরি করা। তাই তখনকার ডাকসাইটে সওদাগরের দলগুলো ছিলো ডাকসাইটে বোম্বেটেদের দলও। ওলন্দাজ আর পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিস, –কতোই না ডাকসাইটে বোম্বেটের দল। এদের ছিলো একটা দারুণ সুবিধে, –বারুদ। প্রথম অবশ্য চীন দেশে তার আবিস্কার। কিন্তু সেখানের

ফুর্তিবাজ বাবুরা এই বারুদ দিয়ে রকমারি আতসবাজি বানাতে ব্যস্ত। কিন্তু ইউরোপে আবিস্কারটা এসে পৌছবার পর সেই বারুদকেই ওরা বন্দুকে-কামানে ব্যবহার করতে শিখেছে, ওদের দাপট তাই অমন সাংঘাতিক।

বোম্বেটেগিরির টাকা, অগাধ টাকা। সেই টাকাকেই পুঁজি করে নিয়ে ওরা নিজেদের দেশে নতুন সভ্যতা গড়তে পারলো, পারলো দৈত্যের মতো বড়ো বড়ো কারখানা খুলতে। একটা নমুনা দেওয়া যাক।

আমাদের দেশ। ভারতবর্ষ। বিপুল ঐশ্বর্য তখন আমাদের দেশে। সেই ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে হরেক রকম বিদেশী বণিকের চোখ চকচক করে ওঠে। তাই সওদাগরের সাজে অনেকে এলো বোম্বেটেগিরি করতে : পর্তুগীজরা এলো, ওলন্দাজ এলো, এলো ইংরেজ, এলো ফরাসী। এদের মধ্যে সবচাইতে ঘুঘু আর সবচাইতে সাংঘাতিক দল হলো ইংরেজ সওদাগরদের দল। ব্যবসার নামে আমাদের দেশ থেকে কী সাংঘাতিক লুঠতরাজ ওরা করেছে। আর ওই লুঠের মোহর জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছে নিজেদের দেশে। যদি নিয়ে যেতে না পারতো তাহলে নিজেদের দেশে অমন জমকালো কলকারখানা-ওয়ালা নতুন সভ্যতা ওরা গড়তেই পারতো না।

ইংরেজ বণিকেরা যখন প্রথম এলো আমাদের দেশে তখন এ-দেশের অবস্থা খুবই ভালো। এখানে ওখানে এমন-কি জাঁকালো শহর পর্যন্ত গড়ে ওঠবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে : তখনকার দিনে লণ্ডন শহরের চেয়ে ঢাকা-মুর্শিদাবাদ মোটেই কিছু ছোটো নয়। আমদানির চেয়ে আমাদের দেশ থেকে তখন রপ্তানিই বেশি। অথচ সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের অতো সমৃদ্ধি সত্ত্বেও আসলে দেশের যেটা সভ্যতা সেটার কোনো শক্তি নেই, কেননা সমাজের গড়নটা হাজার বছরের পুরোনো, পচে-যাওয়া পুরোনো ধরনেরই গড়ন। ধর্মশাস্ত্রের আইন-কানুন অনুসারে গড়া তার ভিত। অথচ, ইংরেজরা তখন এক নবীন সভ্যতার দিকে পা বাড়িয়েছে, জমিদার-পুরোহিতের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করছে, করছে পৃথিবীকে নতুন করে জয় করবার পথ আবিস্কার। তাই ওই বিদেশী বণিকের দল সওদাগরি করতে এসে শেষ পর্যন্ত পুরো দেশটা জুড়ে বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারলো। ব্যবসা করতে এসে একেবারে একটা পুরো রাজত্ব ফেঁদে বসা। বড়ো কম কথা তো নয়। আবার এ-কথা ভুললেও চলবে না যে আমাদের দেশ থেকে অমন সাংঘাতিক লুঠতরাজ করতে না পারলে ওরা নিজেদের দেশে ওই নতুন সভ্যতাকে পুরোপুরি গড়ে তুলতে পারতো কিনা সন্দেহ।

লুঠতরাজটা কী রকম আগে তাই দেখা যাক। সওদাগরি করতে এসে ওরা দেখলো আমাদের দেশে থেকে নিয়ে যাবার মতো জিনিস রয়েছে দেদার; সেগুলো দেশে নিয়ে যেতে পারলে চড়া দামে বিক্রি করা চলে। দেদার লাভ। কিন্তু সত্যিই যদি সওদাগরি হয় তাহলে এতো জিনিসপত্তর নিয়ে যাবার সময় তার বদলে তো কিছু দিতে হয়। কিন্তু দেবার জিনিস কী আছে? এক পশমের তৈরি কাপড়চোপড়

ছাড়া তখনও পর্যন্ত ওদের দেশে এমন কিছু তৈরি হয় না যা তখন আমাদের দেশে নেই; অথচ আমাদের এই গরম দেশে পশমের চাহিদা হবে কেন? তাই, আমাদের দেশ থেকে মালপত্তর সত্যি করে কিনতে হলে ওদের পক্ষে কাঁচা টাকা বয়ে আনা দরকার। কিন্তু এমনতরো ব্যবস্থা ওদের পক্ষে মনঃপূত হতেই পারে না, কাঁচা টাকা জোগাড় করবার জন্যেই বলে ওরা নিজেরা তখন হন্যে হয়ে ঘুরছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বেরিয়েছে সওদাগরি করতে! তাহলে? কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের মতলব ঠিক করে ফেললো। স্রেফ মারপিট, স্রেফ ডাকাতি। জোর করে আমাদের দেশের জিনিস কেড়ে নিয়ে যাওয়া। বন্দুক এলো, কামান এলো, –ওরা বললো লড়াই করবো।

পলাসীর যুদ্ধ। তারপর লুঠ। সে যে কী লুঠ, কী লুঠ, তার হিসেব করাই কঠিন। জাহাজ বোঝাই করে লুঠের মাল চললো ওদের দেশে। মর্জিমতো কোনো লুঠের থলিকে ওরা বললো খাজনা, কোনোটাকে বললো ভেট, নজর নাম দিলো কোনোটার বা। আবার কোনোটার কোনো নামই দিলো না।

কাঁচা টাকার –বা হয়তো সেকালের সোনার মুদ্রার পাহাড় জমলো ওদের দেশে। আর সেই টাকাকেই পুঁজি করে ওরা খুললো বিরাট কারখানা। ওদের দেশের চেহারাটাই বদলে গেলো। তার আগে পর্যন্ত ওদের দেশের কারিগররা ছোটোখাটো হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি দিয়ে পণ্য তৈরি করতো। এবার থেকে তার বদলে বিরাট বিরাট কারখানা। এই যে অদল-বদল এরই নাম দেওয়া হয় শিল্পবিপ্লব। কেমন করে সম্ভব হলো এই শিল্প-বিপ্লব? কেউ কেউ বলেন, কয়েকজন বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকের কয়েকটা আশ্চর্য আবিষ্কারের দরুন এ-বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। হারগ্রীয়েভ্ আবিস্কার করলেন সুতোকল, ওয়াট আবিস্কার করলেন বাষ্পের শক্তিকে মানুষ কেমনভাবে হাতের মুঠোয় আনতে পারে। এই রকম কতোই না আবিস্কার। বিজ্ঞানের আবিস্কারকে নিশ্চয়ই ছোটো করবার কোনো মানে হয় না। তবু শুধু ওই আবিস্কার কটির জন্যেও শিল্প-বিপ্লব সম্ভব নয়। আসল কথা হলো, ওই সব আবিস্কারকে বড়ো বড়ো কারখানা খুলে কাজে লাগাবার কথা। এই কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হলে বিস্তর টাকার দরকার। পুঁজি চাই। মূলধন চাই। তা নইলে তো বিজ্ঞানের আবিস্কার মাঠে মারা যাবে। আমাদের দেশ লুঠ করবার আগেও ওদের দেশে বিজ্ঞানের আশ্চর্য সব আবিস্কার হয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে কারখানা খুলে কাজে লাগাতে পারা যায় নি। কেননা, তখন পর্যন্ত ওদের হাতে কাঁচা টাকার যোগান ছিলো না।

মনে রাখতে হবে, ১৭৫৭-তে পলাসীর যুদ্ধ। ১৭৭৬ থেকে শিল্প-বিপ্লব শুরু।

মানুষ চাই

বিরাট বিরাট শহর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা। পৃথিবীর চেহারাটাই হুড়মুড় করে বদলে যেতে লাগলো! কী তেজ এই নতুন সভ্যতার, যার নাম দেওয়া হয় ধনতন্ত্র!

কল টিপলে গাড়ি চলে, কল টিপলে তাঁত চলে; চোখের নিমেষে মানুষ পার হয়ে যায় দশ-বিশ ক্রোশ পথ, চোখের নিমেষে মানুষ বুনে ফেলে দশ-বিশ জোড়া কাপড়।

অনেক টাকা লাগলো। অনেক পুঁজি জুটলো সওদাগরি করে, তেজারতি করে, ডাকাতি করে। কিন্তু শুধু টাকা হলেই তো হয় না। আরো একরকম জিনিস দরকার। সে-জিনিসের নাম হলো মানুষের মেহনত। কারখানা গড়তে গেলে মানুষ চাই, কারখানাকে চালাতে গেলে মানুষ চাই। কারখানা তো আর আপনি-আপনি গড়ে ওঠে না, কারখানা তো আর আপনি-আপনি চলতে থাকে না। তাই কারখানা ফাঁদতে গেলে নগদ টাকা দিয়ে শুধু ইট-পাথর আর লোহা-লক্কড় আর কাঁচামাল কিনলেই হবে না। আরো একটা জিনিস কিনতে হবে, সে-জিনিসটা হলো মানুষের গতর, কিংবা, আরো ভালো করে বললে বলা উচিত, গতর খাটাবার শক্তি। তার মানে, এমন মানুষ চাই যারা নগদ পয়সার বদলে গতর খাটাতে আসবে। এ-হেন মানুষের নাম দেওয়া হয় দিন-মজুর।

কোথা থেকে পাওয়া যায় ওই দিন-মজুরের দল? যতো দিন সামন্ততন্ত্র ততোদিন দেশের বেশির ভাগ মানুষই যেন খেতের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা : জমিদারের হুকুম ছাড়া জমি ছেড়ে এক-পা নড়বারও উপায় নেই। অবশ্য জমিদারি ব্যবস্থা যতো অচল হয়ে পড়তে লাগলো ততোই প্রজাদের মধ্যে নগদ খাজনায় জমি বিলি করে দেবার ব্যবস্থা দেখা দিতে লাগলো, কিন্তু তাতেও মনের মতো কাঁচা পয়সা মিলছে না দেখে জমিদাররা আবার জমিগুলো কেড়ে নিয়ে সেখানে ভেড়া চরাবার ব্যবস্থা চালু করতে লাগলো। ফলে, অনেক চাষী একেবারে সর্বহারা, একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়লো। খুশিতে ভরে উঠলো ব্যবসাদারদের মন। কেননা, ওই সর্বহারার দল শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে শহরের কারখানায় গতর খাটাতে না গিয়ে যাবে কোথায়? যতোদিন পর্যন্ত গাঁয়ে ভিটেমাটি বজায় থাকবে ততোদিন তো তারা এই ভিটেমাটি আঁকড়েই পড়ে থাকতে চাইবে, কেন যাবে শহরে দিন-মজুর হতে?

শহরের ব্যবসাদাররাও তাই রব তুললো : ভালো ভালো। জমিদারি ব্যবস্থা যতো উচ্ছন্নয় যায় ততোই মঙ্গল। মানুষের মুক্তি চাই। শিকল দিয়ে আর মানুষকে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখা চলবে না। মানুষের মুক্তি চাই। মানুষের মুক্তি চাই।

কিন্তু এই যে মুক্তির জন্যে ডাক এ-ডাক মেহনতকারী মানুষকে সত্যিকারের মুক্তি দেবার জন্যে, সত্যিকারের স্বাধীন করবার জন্যে ডাক নয়। এ-ডাকের আসল মানে হলো তাদের পা থেকে এক রকমের শেকল খুলে আর এক রকম শেকল পরাবার জন্যে ডাক। মুক্তি। কিন্তু কিসের থেকে মুক্তি? নিজেদের ভিটেমাটিটুকু থেকে, নিজস্ব বলতে যা-কিছু তাই থেকেই।

একদিকে অনেক টাকার পুঁজি আর একদিকে অনেক মানুষের যোগান। আর তার ফলে গড়ে উঠলো ওই নতুন সভ্যতা, যার নাম ধনতন্ত্র, যার কীর্তি সত্যিই আশ্চর্য!

মেজাজ বদল

সত্যিই কিন্তু ভারি আশ্চর্য এই নতুন সভ্যতা, যার নাম ধনতন্ত্র। এর মধ্যে যে ফাঁকির দিক নেই তা নিশ্চয়ই নয়। তবু সামন্ত সভ্যতা থেকে এই সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পা বাড়ানো। তাই এদিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মেজাজটাই বদলে গেলো; এই মেজাজ-বদলের বিদেশী নাম হলো রেনেসাঁস। ব্যাপারটা কী রকম? এর আগের যুগটায় ধর্মের মোহ মানুষের মনকে অন্ধ, পঙ্গু, অকর্মণ্য করে রেখেছিলো। মেজাজ বদলের ফলে মানুষ যেন জেগে উঠতে চাইলো। পরকালের স্বপ্ন দেখে আর লাভ নেই; তার বদলে চাই সত্যিকারের জ্ঞান, চাই ভালো শিল্প, চাই বিজ্ঞান। আগেই বলেছি, গ্রীকরা খুব ভালো ভালো বই লিখেছিলো; কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষ সেগুলোর কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলো, ভুলতে বসেছিলো ভালো ছবি আঁকবার, ভালো মূর্তি গড়বার মর্যাদা। মন যখন নতুন করে জেগে উঠলো তখন মানুষের সেই সব পুরোনো আর ভুলে যাওয়া কীর্তিগুলোকে নতুন করে খোঁজ করবার আগ্রহ দেখা দিলো। নতুন নতুন বইও লেখা শুরু হলো, –নতুন কাব্য, নতুন নাটক, নতুন সব জ্ঞানের বই। পণ্ডিতেরা বলতে শুরু করলো : আত্মা আর পরকাল নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে ইহকালের কথাটাই ভালো করে ভেবে দেখা দরকার। মনে রাখতে হবে এই মাটির পৃথিবীর কথা আর রক্তমাংস গড়া এখানকার মানুষের কথা। কেউ কেউ বললো, খ্রীষ্টান ধর্মকেই মানতে হবে কিন্তু একেবারে শুধরে নিয়ে। নতুন করে খ্রীষ্টান ধর্মকে শুধরে নেবার চেষ্টা দেখা গেলো ; এই চেষ্টার নাম দেওয়া হয় রেফর্মেশন্। শুধরে-নেওয়া খ্রীষ্টান ধর্মটা অমন অন্ধ, অমন গোঁড়া নয়। তার চেয়ে বেশি বেশি উদার, অনেক বেশি মুক্ত। ইওরোপে এই সময়টা বরাবরই মানুষ কাগজ তৈরি করতে শিখলো, শিখলো ছাপাখানা বানাতে। তার আগে পর্যন্ত হাতে-লেখা পুঁথিপত্র। ছাপাখানা আর কাগজ পাবার দরুন দেশে লেখাপড়ার প্রচার অনেক বেড়ে গেলো।

দেখা দিলো বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক। নানান বিজ্ঞানে নানান রকম নতুন নতুন আবিষ্কার। ভূগোল, পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, কতোই না। কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন, বেকন, হার্ভে –কতো সব নামকরা-করা বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার এই যুগটায়। অবশ্যই, পুরোনো পৃথিবীর যারা প্রতিনিধি–ওই রাজা-জমিদার আর পাদ্রী-পাণ্ডার দল –ওরা তখন মরীয়ার মতো বিজ্ঞানের পথ রুখতে চেয়েছে। তারা চেষ্টা করেছে বৈজ্ঞানিকদের পুড়িয়ে মারতে, ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে, নির্বাসন দিতে দেশ থেকে। তবু বিজ্ঞানের পথ তারা রুখতে

পারে নি। তার কারণ, তখনকার দিনের বণিক-ব্যবসাদারদের উৎসাহ। বিজ্ঞানকে এরা কাজের ব্যাপার বলে চিনেছিলো, যে-নতুন সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে তাদের আয়োজন বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করতে না পারলে সে-সভ্যতা গড়া যায় না।

তারপর ধরো, নতুন দেশ আবিষ্কারের কথা। আগেই বলেছি, তখনকার দিনের বণিকেরা পৃথিবী জুড়ে সওদাগরি করবার আশায় কেমন করে বড়ো বড়ো নাবিকদের সাহায্য করতো আর সেই সাহায্য পেয়ে নাবিকেরা কেমন করে আবিষ্কার করলো নতুন নতুন দেশ।

এই মেজাজ-বদলের পরিচয় আরো নানান দিকে। যেমন বলা হয়, জাতীয়তা-বোধ আর দেশপ্রেম। জাতীয়তা-বোধ মানে কি? নিজের দেশ, নিজের জাতি নিয়ে গর্ববোধ ; তার সম্মানটা সবচেয়ে বড়ো করে দেখা! ইংরেজরা ভাবতে শুরু করলো :আমরা ইংরেজ, ওটাই আমাদের সম্বন্ধে বড়ো কথা। ফরাসীরা ভাবলো, ফরাসী হবার মতো গর্বের কথা আর নেই। জার্মানরাও ভাবতে শুরু করলো এই ধরনের কথাই। কিন্তু সামন্ত যুগে এমনতরো কথা কারুর মাথায় আসতো না। বরং নানান জাতির রাজা-মহারাজাদের মধ্যে কুটুম্বিতার দরুন সবগুলো মিলে যেন জোট পাকিয়ে ছিলো। তাছাড়া, তখন সমস্ত ইওরোপ জুড়ে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবল প্রতাপ ; তাই পুরো ইওরোপটাই যেন একটা জাত, খ্রীষ্টানদের জাত। কিন্তু সামন্ত যুগের পরমায়ু যতোই ফুরিয়ে আসতে লাগলো ততোই কমতে লাগলো রাজা-মহারাজা আর পাদ্রী-পুরোহিতের দাপট : নতুন যুগের আগুয়ান দল হলো নতুন ধরনের মানুষ, তাদের নাম ব্যবসাদার-সওদাগর। এ-দেশের সওদাগরদের সঙ্গে ও-দেশের সওদাগরের রেষারিষি, ঝোঁকটা তাই এ-দেশ আর ও-দেশের মধ্যে যে তফাত তার ওপরই। ব্যবসাদার-সওদাগরদের মনের কথা হলো, দেশের মানুষ নিজের দেশটাকে সবচেয়ে আপন বলে চিনতে শিখুক, তাহলে নিজের দেশের ঐশ্বর্য বাড়বে, তার মানে ফেঁপে উঠবে, ফুলে উঠবে নিজের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দেশপ্রেমের কথা।

এপিঠ-ওপিঠ

সত্যিই ভারি আশ্চর্য সভ্যতা এই ধনতন্ত্র। এর যা কীর্তি তার পাশে পুরোনো পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যও বুঝি ম্লান হয়ে যায়। আজকালকার বিরাট বিরাট কলকারখানাগুলোর কথা ভেবে দেখো। কোথায় লাগে মিশরের পিরামিড আর ব্যাবিলনের প্রাসাদ? চোখের নিমেষে কী রকম রাশি রাশি জিনিস তৈরি হবার ধুম —কাপড়চোপড়, খাবারদাবার থেকে শুরু করে হাওয়া-গাড়ি হাউই জাহাজ পর্যন্ত কতোই না! রূপকথায় শোনা কোনো অতিবড়ো ডাকসাইটে দৈত্যও কি এমন চোখের নিমেষে এতো রাশি রাশি জিনিস তৈরি করতে পারতো? তার মানে,

আগেকারকালের মানুষ পৃথিবীকে যতোখানি জয় করবার কথা কল্পনাও করতে পারে নি এ-কালের মানুষ সত্যিসত্যিই তার চাইতে অনেক বেশি জয় করতে শিখেছে।

তবু, এতো গৌরবের উল্টো পিঠেই একটা করুণ পরাজয়ের কাহিনী। পৃথিবীকে মানুষ অতোখানি জয় করলো, তবুও মানুষের কপাল থেকে দুঃখ আর অভাবের চিহ্ন মুছলো না। সাধারণ মানুষের কথাটা একবার ভেবে দেখো। যারা খেতে-খামারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, কলকারখানায় গায়ের রক্ত জল করছে —তাদের কথা। সাধারণ মানুষ বলতে, বেশির ভাগ মানুষ বলতে, তো তারাই। অথচ তাদের কপালে যে-দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগই থেকে গেলো। এতো ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়া তো দূরের কথা, দুবেলা হয়তো পেট ভরে খাবারই জোটে না, পরনে জোটে না আস্ত কাপড়, জোটে না মাথা গোঁজবার ঘর। তার মানে, নেহাত যেটুকু না হলে কোনোমতে জান বাঁচে না শুধু ততোটুকু জিনিসই তাদের কপালে।

ধনতন্ত্রের তাই দুটো দিক : একদিকে যেমন আশ্চর্য সম্পদ আর একদিকে তেমনই নির্মম হাহাকার। এ যেন এক তাজ্জব ব্যাপার! আসলে কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার নয়। ধনতন্ত্রের যুগে এমনটা না হয়ে উপায়ই নেই। কেন, তাই দেখা যাক।

মানুষ অনেক অনেক জিনিস তৈরি করতে শিখেছে। কিন্তু হাওয়ায় ফুঁ দিয়ে তো আর জিনিস তৈরি হয় না। কাপড় তৈরি করতে গেলে তাঁত কিংবা কাপড়ের মিল লাগে, হাওয়া-গাড়ি তৈরি করতে গেলে লাগে বিরাট কারখানা। তাঁত কিংবা কাপড়ের মিল, কিংবা হাওয়া-গাড়ি তৈরি করবার কারখানা, কিংবা ওই ধরনের যেসব ব্যাপার তাকে বলে উৎপাদনের উপায়। কেননা এগুলো ছাড়া উৎপাদন হয় না। উৎপাদন মানে হলো নতুন জিনিস তৈরি করা।

এখন ধনতন্ত্রের সময় থেকে হলো কি, ওই উৎপাদনের উপায়গুলো সম্বন্ধে একটা নতুন ব্যাপার দেখা দিলো। যারা মেহনত করে উৎপাদন করছে তারা আর ওই উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক নয়। মালিক হলো অন্য লোক। আগে কিন্তু যখন কারিগররা কিছু তৈরি করতো তখন এ-রকম নয়। তখন পর্যন্ত যে তাঁতি তারই তাঁত, যে কামার তারই কামারশাল। কিন্তু ধনতন্ত্রের যুগে একটা কারখানার কথা ভেবে দেখো। কারখানায় যারা গতর খাটাচ্ছে কারখানাটা কি তাদের? নিশ্চয়ই নয়; তারা তো নেহাত দিন-মজুরের দল। গতর খাটাবার জন্যে দিন গেলে তারা মজুরি পায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

মালিক আসলে অন্য লোক। সে নিজে গতর খাটায় না, নগদ চুকিয়ে অন্য লোককে খাটিয়ে নেয়। তাছাড়া মোট মানুষের তুলনায় এই মালিকের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য : হয়তো তিনজনে মিলে একটা কারখানা ফেঁদেছে, অথচ সেখানে মেহনত করছে তিন হাজার দিনমজুর। মালিকদের সম্বন্ধে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটাই সবচেয়ে জরুরী কথা। তাদের কাছে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই সব কলকারখানা থেকে নগদ টাকা লাভ করা। লাভের আশা ছাড়া আর কিসের আশায় তারা অমন কলকারখানা ফাঁদতে যাবে বলো? আর উৎপাদনের উপায়গুলোর

যারা মালিক তাদের উদ্দেশ্য অনুসারেই তো সমস্ত কিছু উৎপাদন হবে। তাই ধনতন্ত্রের যুগে যেখানেই যা কিছু তৈরি হোক না কেন সর্বত্রই ওই এক উদ্দেশ্য : লাভ, মুনাফা। তার মানে মানুষের অভাব দূর করা নয়।

ধরো, বিরাট একটা কারখানায় কাপড় তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন? উদ্দেশ্যটা কী? দেশের সাধারণ মানুষ ওই কাপড় পরে বাঁচবে বলে? মোটেই তা নয়। তাহলে? কারাখানাটার যে মালিক তার লাভ হবে। সেইজন্যেই তো কাপড় তৈরি। মালিক তাই হিসেব করে দেখবে, কেমনভাবে কাপড় তৈরি হলে তার লাভ সবচেয়ে বেশি। আর কারখানাটার মালিক তো সে-ই, তাই এখানে তার হিসেবমতোই কাপড় তৈরি হতে বাধ্য। যেমন ধরো, দেশের লোক মোটা কাপড়ের অভাবে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু মালিক হয়তো হিসেব করে দেখলো কারখানায় মোটা কাপড় তৈরি করে দেশের লোকের কাছে বেচবার চেয়ে যদি খুব শৌখিন কাপড় তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহলে লাভ অনেক বেশি। কারখানাতে তাহলে রপ্তানির জন্যে শৌখিন কাপড়ই তৈরি হবে না কি? কিংবা ধরো, বাজারে কাপড় নেই, হু-হু করে আগুনের মতো কাপড়ের দর বাড়ছে। তাতে মালিকের ভীষণ লাভ। আর ভীষণ লাভ বলেই মালিক ঠিক করলো, কারখানায় কাপড় তৈরির হার টার উপর রাশ টানা। আগে হয়তো দিনে হাজার গজ কাপড় তৈরি হচ্ছিলো, মালিক ঠিক করলো এখন থেকে দিনে মাত্র সাতশো গজ কাপড় তৈরি হবে। তাহলে, বাজারে কাপড়ের আমদানি আরো কমে যাবে, কাপড়ের দর আরো চড়বে, মালিকের লাভ আরো বাড়বে। কিন্তু তাতে যে দেশের লোকের দুঃখের আর অবধি থাকবে না! মালিক বলবে : তা আমি কী জানি? দেশের লোক যদি কারখানার মালিকহতো তাহলে কিসে তাদের ভালো হয় এই হিসেব অনুসারেই কারখানা চলতো। কিন্তু কারখানার আসল মালিক হলুম আমি, লাভ করতে চাই বলেই তো আমি কারখানা খুলেছি। তাই আমার কারখানা এমনভাবে চলবে যাতে আমার লাভ সবচেয়ে বেশি।

মুনাফার খাতিরে উৎপাদন। দেশে যা-কিছু তৈরি হবে তা শুধু মালিকদের লাভের অঙ্কটা বাড়াবার জন্যেই। আর যদি তাই হয় তাহলে দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে খুব গরিব হয়ে থাকতেই হবে। এ তো খুব সোজা হিসেব। হিসেবটা দেখো।

কারখানার মালিক যদি লাভ করতে চায় তাহলে তো কারখানায় মালপত্তরগুলো তৈরি করতে হবে খুব সস্তায় আর সেগুলো বাজারে ছাড়তে হবে চড়া দরে। সস্তায় মালপত্তর তৈরি করবার কায়দাটা কী? কাঁচা মাল সস্তায় কেনা আর মজুরদের কম মজুরি দেওয়া। তার মানেই কিন্তু দেশের বেশির ভাগ লোককে খুব গরিব করে রাখা। কেননা, সাধারণ মানুষ বলতে, দেশের বেশির ভাগ মানুষ বলতে তো কৃষক আর মজুরই। কাঁচা মাল তো বেশির ভাগই কৃষকদের কাছ থেকে কেনা। তাই সস্তায় কাঁচা মাল কেনা মানেই কৃষকদের গরিব করে রাখা। আর মজুরি কম পেলে মজুররা তো গরিব হয়ে থাকবেই।

ধরো, একটা কাপড়ের কারখানা। সস্তায় কাপড় তৈরি করতে হলে সস্তায় তুলো কেনা চাই। কিন্তু সস্তায় তুলো কেনা মানেই যারা তুলোর চাষ দিচ্ছে সেই কৃষকদের কম পয়সা দেওয়া। তার মানে, গরিব করে রাখা। কিংবা শুধু কারখানায় যারা গতর খাটাচ্ছে তাদের দিনমজুরি বাবদ দেদার টাকা দেওয়া গেলো, তাহলেই কি সস্তায় কাপড় তৈরি হবে? নিশ্চয়ই নয়। তাই যতোটুকু না দিলে মজুররা জানে বাঁচে না তাদের দিনমজুরি বাবদ শুধু ততোটুকুই। তাই লাভের আশায় কাপড় তৈরি করতে গেলে দেশের বেশির ভাগ লোককে গরিব করে রাখতেই হবে। তারপর তৈরি মালগুলো বাজারে ছাড়বার সময় হিসেব করে দেখতে হবে কতো চড়া দরে ছাড়া যায়। যতো চড়া দর ততোই তো লাভ বেশি। আর ওই চড়া দরে বাধ্য হয়ে বাজার থেকে জিনিস কিনতে হয় বলেই দেশের লোকের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

ধনতন্ত্রের যুগে সিপাই-শান্ত্রী আইন-আদালত সবই মালিকদলের হাতের মুঠোয়। তাই তারা নানান রকম কায়দা-কানুন করতে পারে। আর অতো রকম কায়দা-কানুন করতে পারে বলেই দেশের বেশির ভাগ মানুষকে অমন দীন-দরিদ্র করে রেখে নিজেরা দারুণ বড়োলোক হতে পারে।

এই হলো ধনতন্ত্রের চেহারা। একদিকে মাত্র মুষ্টিমেয় মালিকের দল, তাদের অগাধ টাকা, অসীম প্রতিপত্তি। আর একদিকে দেশের সাধারণ মানুষ। তাদের কপালে শুধু ততোটুকুই যতোটুকু না হলে নেহাত প্রান বাঁচানো দায়।

ধনতন্ত্রের তাই দুটো দিক। একদিকে দেখা যায়, মানুষের উৎপাদন-শক্তি কী অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করতে শিখেছে কী অতুল ঐশ্বর্য! আর একদিকে দেখা যায় দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ যেন অভাবের মহাসমুদ্রে ভাসছে।

ঐশ্বর্যের উলটো পিঠেই দারুণ অভাব। শুধু মুনাফার খাতিরেই যদি উৎপাদন হয় তাহলে এমনটা না হয়ে উপায় নেই।

মুনাফার জন্মকথা

কিন্তু কথা হলো, মালিকদের ওই মুনাফাটা ঠিক কোথা থেকে আসে?

মালিকরা মাথা খাটিয়ে কারখানা ফাঁদে। মুনাফা কি ওই মাথা-খাটানো থেকে জন্মায়? কারখানায় মালিকদের টাকা খাটে। মুনাফাটা কি ওই টাকা-খাটানো থেকে জন্মায়? শ্রমিকেরা কারখানায় গতর খাটায়। মুনাফাটা কি ওই গতর-খাটানো থেকে জন্মায়?

এই প্রশ্নের কিনারা করতে হবে। কিন্তু কিনারা করতে গেলে আর একটা কথা খুব ভালো করে বোঝা দরকার : 'দাম' মানে কী? কোনো একটা জিনিসের দাম ঠিক কিসের ওপর নির্ভর করে?

চলতিভাবে আমরা বলি, হাওয়া খুব দামী জিনিস, কেননা হাওয়া না হলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না। তার মানে, আমাদের কাজে লাগে, তাই হাওয়ার দাম আছে। কিন্তু দাম বলতে আমরা শুধুই তো এই 'কাজে-লাগার' কথাটুকুই বুঝি না। কেনা-বেচার কথাও বুঝি, লেনদেনের কথাও বুঝি। যেমন ধরো, আমি দোকানে গিয়ে একটা কলমের দাম জিজ্ঞেস করলাম, দোকানদার বললো : দু-টাকা। তার মানে কি কলমটা আমার কতোখানি কাজে লাগবে এটা তারই হিসেব হলো? মোটেই নয়। কলমটা তো আমার দারুন কাজে লাগবে –কলম না হলে আমি একছত্রও লিখতে পারবো না, লিখতে না পারলে আমার সংসার চলবে না। কিন্তু শুধু দু-টাকা দিয়েতো আর এতোখানি কাজে লাগবার হিসেব হয় না। অথচ কলমটার দামতো দু-টাকাই। কেউ ধরো শখ করে তার কচি ছেলেকে কলম কিনে দিতে চাইলো। কচি ছেলেতো কলমটা কামড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে –কাজে লাগার দিক থেকে কতো কম দাম। তবুও তাকেও ওই দু-টাকা দিয়েই কলমটা কিনতে হবে, কলমটার দাম যে তাই। কিন্তু কোন্ দিক থেকে দাম? কেনা-বেচার দিক থেকে, লেনদেনের দিক থেকে। কাজে লাগবার দিক থেকে নয়। আসলে কাজে লাগার দিক থেকে যে দাম তা নিয়ে কোনো হিসেবপত্তর করা চলে না। শুধু লেনদেনের দিক থেকে যে দাম তাই নিয়েই হিসেবপত্তর করা যায়। যেমন ধরো, একবার একজন কোটিপতি সওদাগর মরুভূমির মধ্যে বিপদে পড়ে গিয়েছে, এক ঘটি জল পেলে তার প্রাণ বাঁচে, নইলে নয়। কাজে লাগার দিক থেকে তাই তখন তার কাছে এক ঘটি জলের দাম কোটি টাকার চেয়ে বেশি। কিন্তু তাই বলে কি হিসেব করে বলা যায় এক ঘটি জলের এতোখানিই দাম?

যে দামটা নিয়ে হিসেবপত্তর করা যায়, 'দাম' বলতে সেই দামটার কথাই বুঝতে হবে। অর্থাৎ কিনা, কেনাবেচার দিক থেকে দাম, লেনদেনের দিক থেকে দাম। একটা কলমের দাম হয়তো দু-টাকা আর একটা হাওয়া-গাড়ির দাম হলো এক লাখ টাকা। কিন্তু কেন? একটার দাম দু-টাকাই বা কেন আর একটার দাম লাখ টাকাই বা কেন? কেননা, কলমটাকে তৈরি করতে মেহনত লাগে সামান্যই, কিন্তু হাওয়া-গাড়ি তৈরি করতে মেহনত লাগে ঢের বেশি। তার মানে, যে-জিনিসটার পেছনে যতো বেশি মেহনত সেই জিনিসটার দামও ততো বেশি।

যেমন ধরো, বছর পঞ্চাশ আগেও রুপোর চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের দাম অন্তত আট-দশগুণ বেশি ছিলো। কেননা তখন অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করতে ভয়ানক মেহনত লাগতো। কিন্তু তারপর অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করবার খুব সোজা কায়দা বের হয়েছে : অনেক কম মেহনত দিয়েই আজকাল অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা যায়। তাই আজকাল রুপোর চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের দাম এতো সস্তা হয়ে গিয়েছে।

আর, যদি মেহনতের ওপরই একটা জিনিসের দাম নির্ভর করে তাহলে পয়সাকড়ির চেয়ে বরং মেহনত দিয়েই একটা জিনিসের দাম বাতলানোই ঠিক হবে না কি? আমরা অবশ্য সাধারণত তা বোঝাই না। তাই শুনতে খানিকটা অদ্ভুত

লাগবে। যেমন ধরো, কলমটার দাম আর দু-টাকা না বলে আমি হয়তো বলবো : এক মিনিটের মেহনত। তার মানে, কলমের কারখানায় একজন শ্রমিক মিনিটে একটা করে কলম তৈরি করতে পারে। এই অনুপাতে হাওয়া-গাড়িটার দাম হয়তো হবে, চৌষট্টি হাজার ঘন্টার মেহনত। তার মানে, হাওয়া-গাড়ি তৈরির কারখানায় একজন শ্রমিক চৌষট্টি হাজার ঘন্টা খাটলে ওই রকমের একটা হাওয়া-গাড়ি বানাতে পারবে। অবশ্য কারখানায় তো আর একজন শ্রমিক আগাগোড়া একটা গাড়ি বানায় না? হয়তো এক হাজার শ্রমিক প্রত্যেকে চৌষট্টি ঘন্টা করে খেটে হাওয়া-গাড়িটা তৈরি করছে। তাই ওই মোট মেহনত বলতে বোঝা উচিত অনেকে মিলে সবশুদ্ধ যত ঘন্টা মেহনত করছে, তাই-ই।

মেহনতের দরুনই দাম। এই কথাটা মনে রেখে চলো এইবার একটা কারখানার হিসেব দেখা যাক। ধরো, একটা কাপড়ের কারখানা। কাপড় তৈরি করবার জন্যে মালিককে প্রথমে নগদ কিছু খরচ করতে হবে : কাঁচামালের (তুলো) দাম বাবদ খরচ, তেল-কয়লার দাম বাবদ খরচ, দিনমজুরদের মজুরির দাম বাবদ খরচ, কলকজ্জাগুলো খাটতে খাটতে জখম হবে তাই তার দাম বাবদও খরচ। মালিকের হালখাতায় অবশ্য ওইসব দাম গুলো টাকা-কড়ি দিয়ে লেখা থাকে, কিন্তু আমরা তো দেখছি দাম বলে ব্যাপারটা আসলে মেহনতেরই ব্যাপার। তাই আমরা মালিকদের খাতায় খরচের দিকটা একটু অন্য রকম ভাষায় লিখবো। ধরো, পাঁচশো হাত কাপড় তৈরি করবার জন্যে মোট খরচ হবে ঃ

তুলো (কাঁচা মাল)	ঃ	১৫০০	ঘন্টা	মেহনতের দাম	
তেল-কয়লা	ঃ	২৫০	"	"	"
কলকজ্জার জখম বাবদ	ঃ	২৫০	"	"	"
দিনমজুরদের মজুরি	ঃ	১৫০০	"	"	"
মোট	ঃ	৩৫০০	"	"	"

তারপর এই তৈরি কাপড়গুলো বাজারে বেচা হবে। কিন্তু ৫০০ হাত কাপড় নিশ্চয়ই মোট ৩৫০০ ঘন্টা মেহনতের দরে বেচা হবে না, তৈরি কাপড়গুলোর দর অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই, ৫০০ হাত কাপড় হয়তো মোট ৫০০০ ঘন্টা মেহনতের দরে বেচা হবে। আর তারপর মালিকের হালখাতায় লেখা হবে ঃ

মোট আদায়	ঃ	৫০০০	ঘন্টা	মেহনতেরদাম	
মোট খরচ	ঃ	৩৫০০	"	"	"
মোট লাভ	ঃ	১৫০০	"	"	"

মালিক বলবে, এই তো মজা। আগে পয়সা ফেললাম, পরে পয়সা কুড়োলাম, মাঝখান থেকে লাভ হয়ে গেলো। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঐ লাভটা এলো কোথা থেকে?

পয়সাতো আর সত্যিই কুমড়ো-বীজের মতো নয় যে মাটিতে ছড়ালেই গাছ গজাবে আর তাতে ফল ফলবে। তাহলে? লাভটা এলো কোথা থেকে? কাঁচা মাল থেকে? মোটেই নয়। যদি ১৫০০ ঘন্টা মেহনতের দাম দিয়ে তুলো কেনা হয় তাহলে তার দাম তাই থেকে যাবে। তেল-কয়লার বেলাতেও তাই, কলকজার আয়ুক্ষয়ের বেলাতেও তাই। কলকজার ব্যাপারটা নিয়ে একটু গোলমাল লাগতে পারে, মনে হতে পারে মালিকের লাভটা বুঝি আসলে ওখান থেকে আসছে। তাই এই ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার। ধরো, দশ হাজার ঘন্টা মেহনতের দাম দিয়ে একটা কল কেনা হলো। কিন্তু কলটা তো আর চিরকাল চলবে না, চলতে চলতে খারাপ হয়ে যাবে আর শেষ পর্যন্ত অচল হয়ে যাবে। তাই কলটার একটা পরমায়ু আছে। ধরো, এই কলটার পরমায়ু হলো দশ হাজার ঘন্টা। তার মানে, কলটা প্রতি ঘন্টা চলবার দরুন তার দাম কমবে –এক ঘন্টা মেহনতের যা দাম সেই দাম কমবে। ওটাই হলো কলটার আয়ুক্ষয় বাবদ খরচ। তাহলে দেখতেই পাচ্ছো, কলটা যতো চলবে ততোই তার দাম কমবে। দাম কিছুতেই বাড়তে পারে না। তাই কারখানা চালানোর যে-লাভ তা কলকজাগুলো চালাবার দরুন হতে পারে না। কল চালানোটা খরচের ব্যাপার, লাভের ব্যাপার নয়।

অথচ, লাভ তো হলো! কোথা থেকে এলো এই লাভ? কাঁচা মাল থেকে নয়, তেল-কয়লা থেকে নয়, কলকজা থেকে নয়। তাহলে? বাকি থাকে তো শুধু আর একটা ব্যাপার : মজুরদের মেহনত। তার মানে, লাভ যা হলো তা ওই মজুরদের মজুরি থেকেই এলো।

ভারি মজার জিনিস মজুরদের এই মেহনত। মালিকেরা অন্য সব জিনিস যে-দরে কেনে সেগুলোর সেই দরেই থেকে যায়। কেবল মজুরদের মেহনতের বেলায় তা নয়। এই জিনিসটাও মালিক নগদ পয়সা দিয়ে কেনে, কিন্তু এটাকে কাজে লাগাবার পর এর দাম বেড়ে যায়। আর, যতোটুকু বাড়ে ততোটুকুই মালিকের মুনাফা; ওই বাড়তি দরটুকুই লাভ। মুনাফাকে তাই ফালতু দর বলতে পারো। এখন, এই ফালতু দরটা –মুনাফাটা –ঠিক কেমনভাবে সৃষ্টি হয় তাই দেখা যাক।

মালিক যখন কারখানার কাজে একজন মজুরকে বহাল করেছে তখন ঠিক করে নিচ্ছে তার মেহনত বাবদ একটা দাম দেওয়া হবে। কিন্তু মেহনতের দামটা কী হবে? শুধু ততোটুকু পয়সা যেটুকু না হলে মজুরের জান বাঁচবে না। মজুরের জান যদি না বাঁচে তাহলে কারখানাটা চালাবে কে? কারখানা তো আপনি-আপনি চলবে না। তাই মেহনত বাবদ ওইটুকু পয়সা দিতেই হয়। কিন্তু তার বেশি নয়। তারপর মজুর গিয়ে কারখানায় কাজ শুরু করলো। আর দেখা গেলো, সারা দিনের মেহনত বাবদ তাকে মোট যেটুকু দাম দেওয়া হয়েছে তার সবটাই উশুল হয়ে যায় তার প্রথম ক-ঘন্টা মেহনত থেকেই। তার মানে, বাকি দিনটা ধরে সে যে-মেহনত করবে তার দরুন সে কোনো দাম পাবে না। অথচ, তার বাকি দিনটার এই মেহনতের

দরুন কারখানায় জিনিস তো তৈরি হচ্ছে। সেই জিনিসের দাম আছে। ওই দামটার জন্যে মালিকের কোনো খরচ নেই। তাই ওই দামটাই মালিকের নগদ লাভ।

ধরো, একটা কারখানায় মজুরকে বহাল করা হলো। ঠিক হলো, সে দশ ঘন্টা করে খাটবে আর দশ টাকা করে মজুরি পাবে। দশ টাকা মজুরি মানে কি? দশ টাকা দিয়ে যে-জিনিস কেনা যায় তারই দাম তো! সেই জিনিস তৈরি করতে হয়তো পাঁচ ঘন্টার মেহনত লাগে। তার মানে, দশ ঘন্টা ধরে খাটবার দরুন মজুর পাবে পাঁচ ঘন্টা মেহনতের দাম। তাই তার বাকি পাঁচ ঘন্টার যে-মেহনত সেই মেহনতের দাম সে পাবে না। তবু ওই ফালতু পাঁচ ঘন্টা মেহনতের ফলে কিছু তো তৈরি হবে, তার তো একটা দাম আছে। সেই দামটা পাবে মালিক। সেটাই তার লাভ।

মালিক যখন মেহনতের দাম দিচ্ছে তখন মেহনতটার আসল দর কতো হওয়ার কথা সে-হিসেব অনুসারে তো দাম দিচ্ছে না; কতোটুকু না হলে মজুরের জান বাঁচে না শুধু সেইটুকু হিসেব করেই দিচ্ছে! অথচ, মজুর তার মেহনত দিয়ে অনেকখানি বাড়তি জিনিস তৈরি করতে পারে –নিছক নিজের বেঁচে থাকবার জন্যে যতোটা জিনিসের দরকার তার চেয়েও অনেকখানি বেশি। এই বাড়তি জিনিসের একটা দাম আছে। সেই দামটাই হলো মালিকের লাভ।

বিপদ ! বিপদ !

মুনাফার খাতিরে সভ্যতা। কিন্তু লাভটা দেশের লোকের নয়, মুষ্টিমেয় মালিকের। দেশের সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত দুর্দশার চরমে পৌছয়, কেননা তাদের দুর্দশা যতো বাড়ে মালিকদের মুনাফাও ততো বেশি হয়। এদিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে কিন্তু কলকারখানাগুলো এতো তেজে, এমন উন্নত হয়ে চলে যে সেখানে যেন পাহাড়-প্রমাণ মালপত্তর তৈরি হয়। আর মালিকরা শেষ পর্যন্ত ওই তৈরি মাল নিয়ে দারুণ বিপদে পড়ে। কেননা, মাল তো শুধু তৈরি হলেই হলো না; সেগুলোকে বিক্রি করাও দরকার। কিন্তু বেচা যায় কী করে? কাকে? দেশের লোকের এমন দুর্দশা যে কেনবার মতো পয়সা নেই। তাদের অবস্থা যদি ভালো হতো তাহলে তারাই কিনতে পারতো। কিন্তু তাদের অবস্থা ভালো করা মানেই মালিকদের মুনাফায় ঘাটতি পড়া। শুধু মুনাফার খাতিরে যে-সভ্যতা সে সভ্যতায় এ-পথ বন্ধ। তাছাড়া মাঝে মাঝে দেখা যায় কলকারখানায় এতো বেশি মাল তৈরি হয়ে গিয়েছে যে বেচবার জন্যে তার সবটুকু বাজারে ছাড়লে দর একদম পড়ে যাবে। তাতেও তো শেষ পর্যন্ত মুনাফার ঘাটতি পড়বে। সে-পথও বন্ধ।

তাহলে?

তাহলে বিপদ। দারুণ বিপদ! কিন্তু বিপদটা যে ঠিক কী নিয়ে তা ভেবে দেখতে গেলে খুবই অবাক হয়ে যাবে। খুব বেশি জিনিস তৈরি করে ফেলবার দরুন বিপদ, পৃথিবীকে খুব বেশি করে জয় করে ফেলবার দরুন বিপদ! এমনিতে তাজ্জব ব্যাপার

বলেই মনে হয় কি? পৃথিবীকে জয় করে পৃথিবীর কাছ থেকে বেশি জিনিস আদায় করাই তো মানুষের আসল উদ্দেশ্য; যতো বেশি জিনিস আদায় হবে ততোই তো মানুষের অভাব ঘুচবে, ঐশ্বর্য বাড়বে! খুব বেশি করে জিনিস আদায় করতে পারলে বিপদ হবে কেন? অথচ ধনতন্ত্রের যুগে দেখা যায় সত্যিই বিপদ। কেননা ধনতন্ত্রের যুগে মানুষের অভাব ঘোচাবার কথাটাই বড় কথা নয়। বড়ো কথা হলো, মালিকের ঘরে মুনাফা যোগানো। তাই বিপদ। বেশি জিনিস তৈরি করে ফেলার বিপদ।

মালিকেরা ভাবে, এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কেমন করে? তারা নানান রকমের চেষ্টা করে। এক রকমের চেষ্টা হলো, বেশি জিনিস তৈরি হওয়া নিয়েই যদি বিপদ বাধে, তাহলে ওই বেশি জিনিসটাকে নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা। এ এক ভারি তাজ্জব ব্যাপার। দেশের লোকের গায়ে কম্বল নেই, শীতে কাঁপছে। অথচ, মালিকেরা লক্ষ লক্ষ কম্বলের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। দেশের ছেলে মেয়েরা দুধ খেতে পায় না, শুকিয়ে মরে। অথচ, মালিকেরা জাহাজ-বোঝাই-বোঝাই টিনের দুধ সমুদ্রের তলায় ফেলে দিচ্ছে। মার্কিন দেশের মতো যে-সব দেশে ধনতন্ত্র খুব উন্নত হয়েছে সেই সব দেশে এই রকম ধবংসলীলা বারবার দেখা গিয়েছে।

মালিকদের পক্ষে আর একটা চেষ্টা হলো, দেশের বাইরে তৈরি মাল বিক্রির জন্যে বাজার যোগাড় করা। দেশের লোক যদি অতো মাল কিনতে না পারে তাহলে অন্য দেশে চালান দিয়ে মালগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু কোন্ দেশে চালান দেওয়া যায়? যে-সব দেশে ধনতন্ত্র সে-সব দেশে তো একই সমস্যা। তাই এমন দেশে চালান দিতে হবে যে-দেশ এখনো পিছিয়ে পড়ে আছে, ধনতন্ত্রের অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। যেমন ধরো ইংরেজ মালিকেরা আমাদের দেশে মালপত্তর বিক্রির ব্যবস্থা করলো। আমাদের দেশ অনেকখানি পিছিয়ে-পড়া দেশ বলেই এখানে ওদের পক্ষে মালপত্তর বিক্রি করার সুবিধে। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া দেশ হলেও সে-দেশেও ব্যবসাদার-কারিগর আছে, বিদেশী মালে বাজার ছেয়ে গেলে তাদের স্বার্থে লাগে, তারা বেঁকে বসে। তাই তাদের ওপর জবরদস্তি করা দরকার। যেমন ধরো, বিলিতী কাপড় আমাদের বাংলাদেশে বিক্রি করবার সময় সাহেব মালিকেরা দেখলো বাঙালী তাঁতিরা গোলমাল বাধাচ্ছে। তাই ওরা বাঙালী তাঁতিদের বুড়ো আঙুলগুলো কেটে দেবার বন্দোবস্ত করলো। কিন্তু এতোখানি জবরদস্তি চালাতে গেলে তো শুধু বাজারটুকু দখল করলেই চলে না। সেপাই-শান্ত্রী দিয়ে দেশটাকে পুরোপুরি শাসনে রাখতে হয়। তার মানেই, দেশটাকে জয় করা দরকার। জাপান যেমন চীন দেশকে জয় করবার চেষ্টা করেছিলো। জয় করতে পারলে মালিকদের পক্ষে কতোখানি সুবিধে দেখো : ওদেশ থেকে চাষীদের ওপর জবরদস্তি করে কাঁচা মাল থেকে তৈরি মাল বানাতে পারবে, তারপর চড়া দরে সেই তৈরি মাল ওদেশের বাজারে ফেরত পাঠানো যাবে।

পিছিয়ে-পড়া দেশের জমিদার-সামন্তরা ভাবে, এ বরং ভালোই ব্যবস্থা। কেননা যে-বিদেশীর দল দেশটাকে দখল করেছে তারা তো নিজেদেরই স্বার্থে দেশটায়

কলকারখানার উন্নতি হতে দেবে না : পিছিয়ে পড়া দেশেও যদি কলকারখানার উন্নতি হয় তাহলে তো সে-দেশেও ধনতন্ত্র দেখা দেবে, আর ধনতন্ত্র যদি দেখা দেয় তাহলে পিছিয়ে-পড়া দেশটাও বিদেশী ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করবে। তাই বিদেশীর শাসনে জমিদার-সামন্তদের বিলক্ষণ লাভ। কেননা দেশে কলকারখানা বেড়ে যাওয়া মানেই জমিদারি প্রথা ভেঙে পড়া; অন্য সব দেশে যেখানে কলকাখানার সভ্যতা গড়ে উঠেছে সেখানে জমিদার-সামন্তদের সর্বনাশ হয়েছে। পিছিয়ে-পড়া দেশের জমিদার-সামন্তরা তাই বিদেশী শাসকদের আদর করে বরণ করে নিতে চায়, উত্তরে বিদেশী শাসকরাও এদের অনেক রকম সুযোগ-সুবিধে দেয়। মাঝখান থেকে দেশটার উন্নতি বন্ধ, যে পিছিয়ে-পড়া দশা সেই পিছিয়ে-পড়া দশাই থেকে যায়।

আকাশে শকুন

তারপর সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় দারুণ যুদ্ধ। মুনাফার খাতিরে যে-সভ্যতা তার পক্ষে পৃথিবীর বুকে এই রকম শকুনের উৎসব থাকা ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না, কেন, তাই দেখো।

পৃথিবীতে পেছিয়ে-পড়া দেশের তো একটা সীমা আছে। আর তাছাড়া, যে-সব দেশে ধনতন্ত্র বেড়েছে সেই সব দেশের মধ্যে কোনো দেশে তা আগে দেখা দিয়েছে আর কোনো দেশে বা পরে দেখা দিয়েছে। তাই, যে-সব দেশে ধনতন্ত্র আগে দেখা দিয়েছে সেই সব দেশের মালিকেরা পেছিয়ে-পড়া দেশগুলোর ওপর আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এইভাবে অনেকদিন আগেই পেছিয়ে-পড়া দেশগুলো নিয়ে একটা মোটামুটি ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপর? ধনতন্ত্র তো থেমে নেই। উৎপাদনের শক্তি দিনের পর দিন বেড়ে যায়, কলকারখানার উন্নতি হতে থাকে, তৈরি হতে থাকে আরো রাশি রাশি জিনিস। যে-সব দেশগুলোয় ধনতন্ত্র পরে দেখা দিয়েছে সেই সব দেশগুলোয় উৎপাদন যখন এইভাবে খুব বেশি বেড়ে যায় তখন সে-দেশের মালিকদের কী গতি হবে? পেছিয়ে-পড়া দেশ যা ছিলো তার তো প্রায় সবই অন্যেরা আগে থাকতে দখল করে নিয়েছে। তাছাড়া, যে-সব দেশে ধনতন্ত্র আগে দেখা দিয়েছে সেই সব দেশের মালিকদেরই বা কী গতি হবে? পেছিয়ে-পড়া দেশ আর কোথায়?

তাই এই অবস্থায় পৌছে ধনতন্ত্রের দেশগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করা ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। পৃথিবী জুড়ে শুরু হয় দারুণ যুদ্ধ, আসলে বাজার জোগাড় করার যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ তো করবে সাধারণ মানুষ। মালিকরা তো আর নিজে হাতে ঢাল-তরোয়াল বা বন্দুক-কামান নিয়ে লড়াই করতে বেরুবে না। কিন্তু সাধারণ লোক যদি বুঝতে পারে এই যুদ্ধের পেছনে আসল মতলব হলো মালিকদের মুনাফা-লোভ তাহলে তো তারা বেঁকে বসবে। কোন্

ব্যবসাদারের কী লাভ-লোকসান হচ্ছে তাই ভেবে আমি মরতে যাবো কেন? তাই মালিকদের তরফ থেকে অনেক সব মিথ্যে কথা রটাবার ব্যবস্থা। সেই সব মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে সাধারণ মানুষকে লড়াইয়ের ফাঁদে ফেলবার কায়দা। বেশির ভাগ খবরের কাগজই তো মালিকদের সম্পত্তি, তাই মালিকরা যখন মুনাফার লোভে লড়াই লাগাবার মতলব করে তখন এই সব খবরের কাগজগুলোয় রাশি রাশি মিথ্যে কথা ছাপিয়ে দেয়। খবরের কাগজে যদি সত্যিকারের খবরই ছাপা হতো তাহলে লেখা থাকতো কোন্ কোন্ দেশের কোন্ কোন্ মালিক-দল মুনাফার নেশায় কী রকম অন্ধ হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উজাড় করবার আয়োজন করছে!

তা ছাড়া লড়াই লাগানোর ব্যাপারে মালিকদের তো আরো একটা মস্ত সুবিধে রয়েছে। তৈরি মাল বিক্রি করা নিয়েই তো সমস্যা। লড়াই করে অন্য দেশ জিতে সেই দেশে মাল চালান দেবার সুবিধে ছাড়াও লড়াইয়ের সময়ে লড়াইয়ের কাজে রাশি রাশি মাল বিক্রি করবার সুযোগও। বন্দুক, কামান আর হাওয়া-গাড়ি হাউই জাহাজ থেকে শুরু করে পলটনদের জামা-জুতো পর্যন্ত কতোই না! এতো সব জিনিসপত্র চড়া দরে বিক্রি করতে পারলে মালিকদের সমস্যার কী রকম সহজ সমাধান হয় তা তো বুঝতেই পারছো। দেখছিলাম মার্কিন দেশের ব্যবসাদারদের একটা কাগজে বেশ খোলাখুলিভাবেই লিখেছে, কোরিয়ায় যুদ্ধ বেধে আমাদের ব্যবসার সমস্যা এ-বছরকার মতো সমাধান হয়েছে!

অবশ্য লড়াইতে বড্ড মানুষ মরে। কিন্তু তাতে কীই বা যায় আসে? ধনতন্ত্রের কাছে মানুষ তো আর আসল কথা নয়। আসল কথা হলো মালিকদের মুনাফা। লড়াই লাগাতে পারলে মালিকরা দেদার মুনাফা পায়। আর তাই আজকের দিনে পৃথিবীর বুক থেকে একটা মহাযুদ্ধের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে আর একটা মহাযুদ্ধ বাধাবার সাংঘাতিক তোড়জোড়!

বিজ্ঞান ঃ কী ও কেন

যুদ্ধ বলে ব্যাপারটা অবশ্য পৃথিবীতে নতুন নয়। আদিম কাল থেকেই এদলে-ওদলে লড়াই হয়েছে। মধ্যযুগ ধরে এদেশে-ওদেশে যুদ্ধ হয়েছে। আজকের মুনাফা-বিহ্বল আমাদের নায়কেরা লুটপাট, বোম্বেটেগিরি আর যুদ্ধ করেই, বড়ো বড়ো কলকারখানা গড়বার মূলধন জুটিয়েছে। তবুও তাদের মনের মতো সমাজে –যাকে বলে কিনা ধনতন্ত্র –সংকট যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততোই এই যুদ্ধের যেন জাত-বদল হতে লাগলো। আগেকার কালের যুদ্ধে যতো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার আয়োজন শুরু হয়েছে আর আজকের দিনের যুদ্ধে যতো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার আয়োজন শুরু হয়েছে –এই দুই-এর হিসেবে একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত। এমনকি পৃথিবীটাই থাকবে কিনা –নাকি মরা ছাই-এর একটা

দলায় পরিণত হতে চলেছে –সে প্রশ্নও আজ আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না! এমনই ভয়ংকর আজকের দিনে, যুদ্ধের তোড়জোড় থেকে অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মানুষ শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছালো কেন? ব্যাপারটা খতিয়ে বুঝতে গেলে কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। আর তাকাতে যদি রাজি হও তাহলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়বে। তাকেই বলে একালের বিজ্ঞান! কথাটা শুনলে হয়তো প্রথমটায় চমকে উঠবে। ওঠবারই তো কথা। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের সদরদোর যারা খুলেছিলেন তাদের চোখের সামনে ছিল একেবারে অন্য একটা ছবি। মানুষের অনন্ত বা অফুরন্ত কল্যাণের ছবি। তাদের কাছে প্রকৃতিকে দিনের পর দিন আরো ভালো করে চিনে –আর তারই ভিত্তিতে আয়ত্তে এনে –মানুষের কল্যাণ সাধনের বুঝি শেষ নেই। আর সেই বিজ্ঞানই কিনা আজ মানুষকে আতঙ্কে বিহ্বল করবার মতো এক জুজুবুড়ির রূপ ধরতে চাইছে! জুজুবুড়ি অবশ্যই গল্পকথা। কিন্তু আজকের আতঙ্কটা মোটেই তা নয়। অতি বড়ো সত্যি বলে যদি কিছু ভাবা যায় তাহলে সেই-জাতেরই ব্যাপার।

এমনটা হলো কেন? তাহলে কি বিজ্ঞানের পথে এগুতে গিয়ে মানুষ গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করে বসেছে? আগেকার কালে দুঃখ ছিল, দৈন্য ছিল, ছিল নির্যাতিত মানুষের বুক ফাটা কান্না। আধুনিক বিজ্ঞানের যখন জন্ম, তখন তার প্রতিজ্ঞা মানুষকে এসবের হাত থেকে চিরকালের মতো মুক্তি দিতে হবে। কোথায় গেল সেই প্রতিজ্ঞা, সেই শপথ? তার বদলে আজ হঠাৎ এমন বিভীষিকা, একেবারে রসাতলে পাঠাবার এ-হেন আতঙ্ক?

প্রশ্নটার উত্তর ভালো করে বুঝতে হবে। না-হলে আমাদের গল্পের আসল কথাটাই অস্পষ্ট থেকে যাবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যখন সবে শুরু তখন এই বিজ্ঞান বলতে সত্যিই মাত্র কতোটুকু? আজকের দিনের তুলনায় তা যেন নেহাতই ছেলেখেলার ব্যাপার। কিন্তু তারপর-দিনের পর দিন –মানুষেরই চেষ্টায় বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। যতো এগিয়েছে ততোই বেড়ে চলেছে তার এগুবার গতি। এগুবার হারটা খুবই বড়ো কথা। হিসেব করলে দেখা যাবে, গত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞান যতোটা এগিয়েছে তার তুলনায় আগেকার কালের পুরো পাঁচ হাজার বছরের মোট অগ্রগতিও যেন তুচ্ছ!

কিন্তু বিজ্ঞান যতোই এগিয়েছে –যতো এগুচ্ছে –ততোই তার নিজের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আগেকার কালে একজন বিজ্ঞানী একাই তার পুরো গবেষণার ভার নিতে পারতেন। কিন্তু একালে আর তা সম্ভব নয়। অত্যন্ত জটিল আর রকমারি যন্ত্রপাতি দরকার হয়, দরকার হয় সাহায্য করবার জন্যে একদল সহকারী কর্মী। এসবের খরচ এমনই বেশি যে বিজ্ঞানীটির পক্ষে নিজের থেকে যোগানো অসম্ভব। তাহলে টাকাটা আসে কোথা থেকে? বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, সরকার থেকে। কিন্তু সরকারের ভাঁড়ারে অমন বিশাল টাকা ঢালবে কে? খাজনা-টাজনা বাবদ সরকারের যা আয় তা ছাড়াও ঢের ঢের টাকা দরকার। কোথা থেকে আসবে

বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে বাড়তি বিশাল টাকাটা? কোটিপতিদের কাছ থেকে ছাড়া অমন কোটি কোটি টাকা পাবার আর কি উপায়? অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রাঘব বোয়ালের মতো বড়ো বড়ো শিল্পপতিদের কাছ থেকেই। হয়তো সরাসরি নয়; অনেক সময় সরকারি ভাঁড়ার ঘুরে, অনেক সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র ঘুরে বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় মারফত কখনো বা। কিন্তু শিল্পপতিরা তো দানছত্র খুলে বসে নি। তাদের একমাত্র হিসেব বলতে মুনাফা –অগাধ মুনাফা। বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে তারা যে খরচটা করতে রাজি সেটার পেছনেও একই উৎসাহ, একই উদ্দেশ্য। তাই সাধারণ মানুষ জানুক আর নাই জানুক, ওই শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা সরকারে জাঁকিয়ে বসে; জাঁকিয়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয় আর গবেষণাকেন্দ্রগুলির পরিচালক সমিতিতে। এরাই একটা নীতি বেঁধে দেবে ঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে ফলাফল তা কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। কথাটা আমেরিকা-ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অতি বড়ো সত্য।

একই গবেষণার ফল মোটের ওপর দুরকম উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের কল্যাণ বা মানুষের সর্বনাশ। নমুনা হিসেবে দু-চার কথা বলে রাখা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতে হতে আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে তা ঠিকমতো বুঝতে পারাই দুস্কর এবং এই ফল মানুষকে দিয়েছে দুর্বার শক্তি। একদিকে পুরো দুনিয়া থেকে অন্নাভাব, চিকিৎসার অভাব একেবারে চিরকালের মতো মুছে ফেলবার শক্তি; অন্যদিকে অতি ভয়ংকর জীবাণু-অস্ত্র তৈরি করবার শক্তি, দেশকে-দেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত করবার মতো ক্ষমতা।

প্রশ্নটা তাই, এই সব শক্তিকে কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হবে? প্রশ্নটার মাত্র দুটো উত্তর সম্ভব। মানুষের কল্যাণ আর মানুষের ধ্বংস। ওই সব একই শক্তি মানুষের কল্যাণে লাগালে প্রায় যেন রাতারাতি দুনিয়ার চেহারাটাই বদলে দেওয়া যায়। প্রায় অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার পারমাণবিক শক্তির। জীববিজ্ঞানের নতুন আবিস্কার কাজে লাগাতে পারলে কৃষিকাজ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান পর্যন্ত সর্বত্রই মানুষের কী অনন্ত আশা –সকলের নাগালেই খাদ্য ও রোগমুক্তির সম্ভাবনা এমন অসম্ভব বেড়ে যায় যে তা প্রায় কল্পনার অতীত। পৃথিবীর নানা অনুন্নত দেশের মানুষ আজ প্রায়ই নিরন্ন, অনেক দেশেই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কাতারে কাতারে মানুষ মরছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারলে পৃথিবী থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব অনটন কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু দায় পড়েছে ওসব কথা ভাববার। মালিকদের হিসেবের খাতাটাই অন্য রকম। তাতে শুধু মুনাফার হিসেব। তাই সরকার থেকে শুরু করে গবেষণাকেন্দ্রগুলোয় তাদের যারা তাঁবেদারি করছে তারাও প্রভুদের স্বার্থে এই হিসেবের গণ্ডি পেরুতে নারাজ। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলো কোন্ কাজে লাগাতে পারলে ওই মুনাফার চাহিদা সবচেয়ে ভালো করে –সবচেয়ে বেশি করে –মেটানো যায়? যুদ্ধের জন্যে ভয়ংকর সব মারণাস্ত্র তৈরি করতে পারলে। পরমাণু শক্তি চালিত একটা ডুবোজাহাজ বা উড়োজাহাজ বোঝাই একটা যুদ্ধের জাহাজ তৈরির ফরমাস

পেলে তার থেকে যে নগদ লাভ তার কি কোনো সীমা পরিসীমা আছে? এ-হেন শুধু একটা জাহাজ বানাতে যা খরচা তাই দিয়ে আফ্রিকার ছোটোখাটো একটা পুরো দেশের চেহারাই তো পাল্টে দেওয়া সম্ভব; সেখানে আর অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন, রোগাক্রান্ত কোনো একটি মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না! কিন্তু শিল্পপতিদের তাতে কী আসে যায়? মুনাফা মিলবে কিছু? কতোটা?

বিজ্ঞানের আবিস্কারকে মারণাস্ত্র তৈরি করার কাজে লাগানোর আরো একটা মস্ত সুবিধে আছে। সাধারণ জীবনে ব্যবহারের জন্যে কাপড়-চোপড়ের মতো জিনিস তৈরি করবার মহা ঝামেলার কথা আগেই বলেছি। কিনবে কে? বাজারের তো একটা সীমা আছে। খদ্দেরদের নাগালের বাইরে বাড়তি জিনিস তৈরি হলে অনেক সময়ই ইচ্ছে করে তা নষ্ট না করে উপায় নেই। নইলে এসব জিনিসের দামএমনই পড়ে যাবার ভয় যে, মুনাফার কথা ভুলে যেতে হয়।কিন্তু যুদ্ধের অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে এই ভয় একে বারেই নেই। বাজার যেন অফুরন্ত। শুধু রটিয়ে দিতে পারলেই হলো, দেশের সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রগুলো মামুলি হয়ে গেছে; তাই অন্য দেশের তুলনায় অনেকটাই অকেজো –যুদ্ধ লাগলে আগেকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কাজ চলবে না। ব্যস! এই কথাটি রটিয়ে দেওয়া মাত্রই দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে থেকেই সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হবে। বাতিল করো ওই সব মামুলি অস্ত্র; আধুনিক অস্ত্র তৈরি করার জন্যে নতুন ফরমাস দেওয়া হোক। কথাটা কায়দা-মাফিক রটাবার একটা সোজা উপায়ও আছে। যুদ্ধে যারা সেনানায়কের কাজ করে সবে অবসর নিয়েছে এহেন বেশ কিছু লোককে সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা-র্নিুয় সমিতিতে বসিয়ে দাও ; অমন অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শে সাধারণ মানুষ বরং খুশিই হবে। আর এহেন অভিজ্ঞ লোকগুলিকে খুশি করবার সবচেয়ে সোজা কায়দা এদের দেদার টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখো। স্রেফ ঘুষ? শব্দটা কতো খারাপ। শুনতে কানে লাগে। কিন্তু বোধহয় খেতে ভালো। যারা খায় তারা খুশিই হয়। আর কর্তাদের কাছ থেকে এইভাবে অজস্র টাকা পেলে তারা বিশেষজ্ঞ হিসেবে অনায়াসেই ঘোষণা করবে : আগেকার কালের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেলে শিল্পপতিদের ফরমাস দাও নতুন আর আরো মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে। কী করে করা যায়? তার জন্যে তো বিজ্ঞানের গবেষণা চলছে। কাজে লাগাও সেই বিজ্ঞানকে।

কথাগুলো হয়তো খুব সোজা করে বললাম। কিন্তু সোজা ভাষায় বললেই সত্যি কথাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। টি ভি থেকে শুরু করে সবরকম প্রচার যন্ত্রেরও মালিক ধনতান্ত্রিক দেশের যে-বাস্তুঘুঘুরা ছলে-বলে লোকের সামনে রকমারি মিথ্যে কথার ডালি সাজিয়ে, আর আরো অনেক উপায়ে সাধারণ লোকেরই ভোট কুড়িয়ে সরকার জাঁকিয়ে বসে, দিনকে রাত বানায় –সাধারণ লোকই তো তাদের ভোটের পাল্কি কাঁধে বয়ে সরকারে বসিয়েছে। তার জন্যে কতো খরচা করতে হয়েছে সে-সবের হিসেব করে লাভ কি! সেই খরচাই হাজার গুণ বেড়ে, ফেঁপে ফুলে কী রকম চেহারা নেবে, সেইটেই আসল হিসেব।

পারলে লাগাও যুদ্ধ। যুদ্ধ লাগাতে না পারলেও একটা গেল-গেল রব তো তোলা যায়। ওই বুঝি শত্রুর পাল এলো বলে। তাকে যুদ্ধ বলে না। বলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। অনেক সময় ওতেই চলে। সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। যুদ্ধের আয়োজন করতে করতেই পাহাড়-প্রমাণ মুনাফা জোটে।

পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী

কিন্তু সাধারণ মানুষ? গ্রামের কৃষক আর শহরের শ্রমিক? তারা কি হাত গুটিয়ে চুপটি করে নিজেদের সর্বনাশের আয়োজন শুধু শুনেই চলবে? নিশ্চয়ই নয়! যদি তাই হতো তাহলে মানুষের গল্প ওইখানেই শেষ হতো। শেষ হতো সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের কীর্তির কথা।

কিন্তু তা হয় নি। হবে না। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ আওয়াজ তুলেছে : দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। পায়ের শেকল ছাড়া তোমাদের হারাবার মতো আছে কী? অথচ জয় করবার জন্যে তোমাদের সামনে তো পুরো পৃথিবীই। তবে এক হতে হবে। এক হয়ে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে আজকের পৃথিবীতে বিশাল বিশাল কলকারখানা থেকে শুরু করে উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপর একমুঠো মানুষের মালিকানাটাই যতো নষ্টের গোড়া। বিজ্ঞানের নানা আশ্চর্য আবিস্কারগুলোকে মানুষের কল্যাণে যাতে না লাগানো হয় তারই হাজারো ফন্দি-ফিকির! সেই আবিস্কার কাজে লাগিয়েই মালিকের দল [illegible]-বারো মুনাফা লুঠছে; আর তা যে পারছে তার আসল কারণটা হলো উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপর তাদের দখল। আর তাই যদি বদলানো যায় —বদলানো যায় ওই উপায়গুলোর ওপর মুষ্টিমেয় মালিকের মালিকানা —তাহলেই অবস্থাটা যায় একেবারে পাল্টে। কিন্তু আজকের মালিকদের হঠাতে পারলে ক্ষমতা আসবে কাদের হাতে? সাধারণ মানুষের হাতে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর শুধু কথার কথা নয়। তাদের পুরো দলটাকে বলে সমাজ —আজকের মতো সমাজ নয়, সমাজের একেবারে রদবদল করে সত্যিকারের সাধারণ মানুষের স্বার্থে ঢেলে সাজানো নতুন রকম সমাজ। হাজারো কারচুপি করে এই নতুন ছাঁচে ঢালা সমাজটা হাতেগোনা মালিকদের স্বার্থে চলবে না, থাকবে না তাদের দেশ চালানোর ক্ষমতা। এই রকমের একটা সমাজ গড়তে পারলে পুরো দেশটার চেহারা পালটে যাবে, আর সব দেশের মানুষ যদি এই নতুন পথে এগুতে পারে তাহলে বদলে যাবে পুরো পৃথিবীর চেহারাটাই। পৃথিবীতে আসবে নতুন পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ মারার কল বানানোর পালা শেষ হবে। শুরু হবে বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে লাগানোর পালা।

কিন্তু তাও আবার হয় নাকি? মালিকদের হাতে অমন অজস্র সেপাইশান্ত্রী। লাঠিসোঁটা তো দূরের কথা; বন্দুক কামান থেকে শুরু করে হাজারো রকম অস্ত্রশস্ত্র। এরা তো সবাই মালিকদেরই ভাড়া খাটছে। মালিকদের বিরুদ্ধে এতোটুকু রা তুললে এরা তো একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে; টুঁটি টিপে ধরবে সাধারণ মানুষের। দলে-পিষে শেষ করতে শুরু করবে যারা মালিকদের বিরুদ্ধে এতোটুকু রব তুলেছে।

ব্যাপারটা তাই মোটেই সহজ নয়। কিন্তু সহজ না হলেও সম্ভব। মানুষের গল্পেই তার নজির রয়েছে। রুশ দেশে খেটে খাওয়া মানুষ এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল চীন দেশে। দাঁড়াবার আয়োজন করছে আরো নানান দেশে। ফলে মালিকের দল শেষ পর্যন্ত সত্যিই সামাল দিতে পারে নি। হার মানতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অমন সহজ নয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থে ক্ষমতা দখলের পরেও এসব দেশেও নতুন নতুন সমস্যা উঠছে, আর তা সমাধানের জন্য খুঁজতে হচ্ছে নতুন নতুন উপায়। সমস্যাগুলো দেখে অনেকেই কমবেশি হতাশ হয়েছেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, মানুষের এগিয়ে চলার আর কোনো পথ নেই, মানুষের পক্ষে ফিরতি পথে পেছুবারও কথা ওঠে না। তাই যে-সব সমস্যা উঠেছে, উঠছে, হয়তো আরো উঠবে –তার সমাধান মানুষই বের করবে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

আর একটা কথা ভুললে চলবে না। মানুষের পুরো ইতিহাস কতো বছরের? তার তুলনায় আজকের সমস্যাগুলোর বয়েস ক-দিনেরই বা? মালিকদের হাত থেকে শক্তি কেড়ে নেবার কথা তো এই সেদিনের ব্যাপার –মাত্র বছর সত্তর হতে চললো। মানুষের পুরো ইতিহাসটার কথা ভাবলে চোখের পলকও নয়। এই সত্তর বছরের পরীক্ষায় যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোকে চিরকালের সমস্যা বলে ভাবতে যাওয়া বেকুবি নয় কি? এককালে মানুষ সামান্য পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে বাঁচবার আয়োজন করেছিল। সেইখান থেকে শুরু করে মানুষ আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে! মানুষের এগুবার পথে আজো যতো বাধা তার সমাধানে মানুষের সামনে যেন অনন্তকাল পড়ে আছে।

মরিয়ার শেষ কামড়

কথা উঠেছে, মানুষ কি সত্যিই আরো অতোদিন বাঁচবে? পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী গড়বার বদলে পুরো পৃথিবীটাই না ছাই হয়ে যায়! যারা প্রভু, যারা মালিক - তারা কি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে চলার পথ সহজে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয়ই নয়। মরণ সুনিশ্চিত জানলে জানোয়ারও একটা মরণ কামড় দিতে কসুর করে না। মালিকের দলও তার কসুর করে না; করবে না।

আধুনিক বিজ্ঞানকে কব্জায় এনে মানুষ যে-সব মারণাস্ত্র তৈরি করছে তাই নিয়ে একবার স্বার্থরক্ষার শেষ চেষ্টা করবে না কি?

এই তো সেদিনের কথা। আজ থেকে বছর চল্লিশও পুরো হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হবো হবো। জাপানের রাজনৈতিক আর সামরিক শক্তি তখন ফুরিয়ে এসেছে। বড়ো রকমের নরহত্যার সত্যিই তেমন দরকার নেই। এ-হেন অবস্থায় আমেরিকা উড়োজাহাজ থেকে জাপানের দুটো শহরের ওপর অ্যাটম বোমা ফেললো। ফলে, হিরোসিমা শহরে চোখের নিমেষে প্রায় ষাট হাজার মানুষ পুড়ে খাক হয়ে গেল, নাগাসাকি শহরে পুড়ে খাক হয়ে গেল হাজার ত্রিশ মানুষ! এই হলো মালিক শ্রেণীর মরণ কামড়ের একটা নমুনা। দুনিয়ার মানুষকে যেন সমঝে দেওয়া, কী ভয়ংকর মারণাস্ত্র ওদের হাতে।

কিন্তু সেদিনের অ্যাটম বোমার তুলনায় আজকের তৈরি বোমাগুলোর তেজ ঢের ঢের জটিল। প্রথমত, এ-হেন মারণাস্ত্র আজ আর শুধু একটা দেশের মধ্যে আটকে নেই; যে-সব দেশে উৎপাদনের উপায়গুলোর ওপর মুষ্টিমেয় মালিকের দখল খতম করার প্রয়াস, সে-সব দেশেও এ-হেন অস্ত্র তৈরি হয়েছে।

পাশের ঘরে পিস্তলধারী ডাকাত ঢুকেছে শুনলে আমার পক্ষেও একটা পিস্তল খোঁজার দরকার পড়ে। কিন্তু সে-কথা না হয় বাদই দিলাম। বিজ্ঞানের আর একটা হিসেব রয়েছে। এ-হেন মারণাস্ত্র শুধু ব্যবহার করলেই হলো না; তার ফলাফল আসলে অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। এই পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয় তেজস্ক্রিয় বস্তুর মেঘ; সে-মেঘ পৃথিবীতেই নেমে আসে। ওই তেজস্ক্রিয় বস্তুর মধ্যেও নিশ্চিত মৃত্যুর স্বাক্ষর। তাই কোনো একটা দেশ এ-হেন অস্ত্র ব্যবহার করলে তা থেকে তৈরি মেঘের তেজস্ক্রিয় বস্তুর সেই দেশের ওপরেও নেমে আসবার সম্ভাবনা।

সোজা কথায়, মারতে গেলে আজ মরতেও রাজি হতে হবে। কথাটা শুধু সাধারণ মানুষদের বেলায় নয় –মালিকদের বেলাতেও সত্যি।

তাহলে কি বলবো, দেশে-দেশে মানুষে-মানুষে যে ভ্রাতৃভাবের স্বপ্ন প্রাচীন কাল থেকে জ্ঞানীগুণীরা দেখে এসেছেন –প্রচার করতে চেয়েছেন –তাকে আজ বাস্তবে সফল করতে নিয়ে যেতে চায় সব চেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্রই? প্রশ্নটার উত্তর আসলে খুব সোজা নয়। কেননা, আজো পৃথিবীতে অনুন্নত দেশের সংখ্যা বড়ো কম নয়। সে-সব দেশ তাঁবে রাখবার জন্যে অমন ভয়ংকর মারণাস্ত্র দরকার পড়ে না; সাবেক কালের বন্দুক-বেয়নেটই যথেষ্ট। তাছাড়া উন্নত দেশগুলিতেও প্রচার মাধ্যমের শক্তি এমনই প্রবল যে নিঃস্ব শ্রমিকদের মনে রকমারি কিম্ভূতকিমাকার মিথ্যা প্রচারের বিপুল আয়োজন। ফলে তাদের পক্ষেও এক হওয়া –সংগঠিত হওয়া –বড়ো সহজ কথা নয়।

সহজ নয়। কিন্তু হতেই হবে। এ-হেন একটা চেতনা দিনের পর দিন বেড়ে চলুক। তা চললে মানুষের গল্পে একটা দারুণ নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে।

দেখা যাক, মানুষের গল্প সত্যিই কতোটা বাধা পাবে। দেখা যাক, আধুনিক কালের নতুন পৃথিবী কতদিনে পূর্ণ বাস্তবে পরিণত হবে। তবে একটা কথা কিছুতেই ভোলা চলবে না। এই গল্পের আসল নায়ক-নায়িকা বলতে তুমি, আমি, আমরা সকলে। তাই গল্পটা শুধু শোনবার বা জানবার ব্যাপার নয়। আগামীকালের অবস্থাটা নির্ভর করছে তুমি আমি –আমরা সকলে –কতোটা সার্থকভাবে এই গল্পেরই পরের অধ্যায় রচনা করবার জন্যে কোমর বাঁধতে পারি –বুঝতে পারি, জানতে পারি; আর সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যিই হাত লাগাতে পারি।

সোফির জগৎ

মূলঃ ইয়স্তেন গার্ডার

অনুবাদঃ জি এইচ হাবীব

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নিয়ে একটি চমকপ্রদ, অভাবনীয় উপন্যাস!

সোফি অ্যামুন্ডসেন। চোদ্দ বছর বয়েসী এই নরওয়েজিয় বালিকা একদিন তাদের বাসার ডাকবাক্সে উঁকি মেরে দেখতে পায় সেখানে কে যেন অবাক-করার মতো দু'টুকরো কাগজ ফেলে রেখে গেছে। কাগজ দুটোয় স্রেফ দুটো প্রশ্ন লেখা:

"তুমি কে?" আর "এই পৃথিবীটা কোথা থেকে এল?"

অ্যালবার্টো নক্স নামের এক রহস্যময় দার্শনিকের লেখা সেই রহস্যময় চিরকূট দুটোর সেই কৌতূহল উস্কে দেয়া প্রশ্ন দুখানিই সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল প্রাক-সক্রেটিস যুগ থেকে সার্ত্রে পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের রাজ্যে এক অসাধারণ অভিযাত্রার। পরপর বেশ কিছু অসাধারণ চিঠিতে আর তারপর সশরীরে, পোষা কুকুর হার্মেসকে সঙ্গে নিয়ে, অ্যালবার্টো নক্স সোফি-র কৌতূহলী মনের সামনে দিনের পর দিন একের পর এক তুলে ধরলেন সেই সব মৌলিক প্রশ্ন। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে যেসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছেন বিভিন্ন দার্শনিক আর চিন্তাশীল মানুষ।
কিন্তু সোফি যখন এই চোখ ধাঁধানো আর উত্তেজনায় ভরা আশ্চর্য জগতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই সে আর অ্যালবার্টো নক্স এমন এক ষড়যন্ত্রের জালে নিজেদেরকে বাঁধা পড়তে দেখল যে খোদ সেটাকেই এক যারপরনাই হতবুদ্ধিকর দর্শনগত ধাঁধাঁ ছাড়া অন্য কিছু বলা সাজে না।

অসাধারণ... তিন হাজার বছরের চিন্তার ইতিহাসকে ইয়স্তেন গার্ডার চারশ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত জটিল সব বিতর্কিত বিষয়কে, অথচ সেগুলোর গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়নি এতটুকু। ...সোফির জগৎ এক অসাধারণ কীর্তি।

-সানডে টাইমস

সব বয়েসি পাঠকের উপযোগি এ বইটি বাংলাসহ মোট ৪৮টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।